সম্ভবামি যুগে যুগে

সম্ভবামি যুগে যুগে

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্মমহাসভা ॥ অবন্তীপুর

প্রথম প্রকাশ : শুভ জন্মাষ্টমী-তিথি
১৭ ভাদ্র ১৩৬৯
৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬২

পরিবেশক : জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধনআশ্রম
পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা

প্রচ্ছদলিপি : শ্রীবারীন সরকার

প্রকাশক : শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দে
শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্ম্মমহাসভা
অবন্তীপুর
পোঃ মণ্ডলপাড়া, ২৪ পরগণা

মুদ্রাকর : শ্রীবিবেকরঞ্জন দাস
অনুশীলনী প্রকাশন,
২০ কলেজ রো, কালিকাতা-৯

নিবেদন

যাঁরা ভাগবতধর্মের অনুসরণ করেন, তাঁরা বলেন, সংসারে তিনটি জিনিস দুর্লভ—নরত্ব, সাধুসঙ্গপ্রাপ্তি ও ভগবদ্ভজনে অনুরক্তি।* জগতে প্রাণিমাত্রেই জীবন ধারণ করে কিন্তু ভগবদ্‌ভজনের মহৎ অধিকার ও গৌরব শুধু মানুষেরই।

মানুষের আর একটি বিশেষ সৌভাগ্য আছে। যাঁর কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, তিনিই মানুষের প্রতি পরম করুণাবশত যুগে যুগে নরবপু ধারণ করে অবতীর্ণ হন। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী।

যাঁরা নরবপুধারী ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁর গুণগান ও লীলাকীর্তন করেন, তাঁরা সিদ্ধ দেহ বা ভাগবতী তনু লাভ করে ধন্য হন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের ও অখিলরসামৃতসিন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেই ভক্ত তুলসীদাস ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর দিব্যজন্ম লাভ করেছিলেন।

আমাদের এই বাংলা দেশের একটা বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, এই দেশেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগধর্ম-স্থাপন ও প্রেমধর্ম-প্রচারের জন্যে শ্রীমতী রাধার ভাব-কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

'সম্ভবামি যুগে যুগে' গ্রন্থে নরবপুধারী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের পুণ্য ও রম্য চরিত-কথা সংক্ষেপে যথাশক্তি আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি। 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্' ও 'নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্' প্রবন্ধ-দুটি সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এক্ষণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হ'ল। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

* আচার্য শঙ্কর বলেন—

'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দৈবানুগ্রহহেতুকম্
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥'

এই গ্রন্থ-রচনার পরিকল্পনা ও প্রেরণার মূলে রয়েছেন 'জিজ্ঞাসা-প্রকাশন' প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী উদার চরিত বন্ধুবর শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

শ্রীশ্রীঅক্ষয়ধর্মমহাসভা (অবন্তীপুর) নামক প্রতিষ্ঠানটি পুস্তকখানির প্রকাশনে উদ্যোগী হয়ে আমায় অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছেন।

যদি শ্রীভগবানের আশীর্বাদে একটি মাত্র ভক্তের অন্তরেও কথঞ্চিৎ তৃপ্তি দান করতে পারি, তবেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সফল মনে করব। ইতি—

ভক্তপদরেণুপ্রার্থী
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস।
খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য প্রকাশ॥
তবে নিত্যানন্দস্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়ভুজ দর্শন॥

আদিলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

'সম্ভবামি যুগে যুগে' আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় গ্রন্থ। আমাদের প্রথম গ্রন্থ 'গীতায় সমাজদর্শন' সুধীজন-সমাদৃত হয়েছে—এ সমাদর ভগবান বাসুদেবের আশীর্বাদের ফলস্বরূপ। সেই আশীর্বাদকেই অক্লান্তভাবে সম্বল করে আমরা আমাদের দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হলাম। দেশব্যাপী নৈরাশ্যে ভগবৎ-আদর্শই যে আমাদের পথ দেখাতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভক্তজনের নিত্য আবৃত্তির জন্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে কয়েকটি স্তব সন্নিবিষ্ট হ'ল।

ভাগবতী কথা যত বেশি আলাপ-আলোচনা হয় তত বেশি লোকসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। মানুষ সাধুসঙ্গও করে, কল্যাণের পথে নিজেদের চালিত করবার জন্য। বিভিন্ন ভাবধর্মে উদ্বুদ্ধ ছোট বড় কত প্রচেষ্টা কত ভাবেই না একই লক্ষ্য অনুসরণ করে আসছে। আমাদের প্রচেষ্টা এমনিভাবেই শুরু হয়েছে। আমরা অতি দীন, আমাদের শক্তি-সামর্থ্যও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তবুও উৎসাহের অভাব নেই। সাধ্যমতো ভাগবতী কথা-প্রসঙ্গ আমরা আলোচনার ব্যবস্থা করেছি, কিছু প্রকাশনার কাজও হাতে নিয়েছি।

এপথে যাঁরা আমাদের প্রেরণা দিয়েছেন তার মধ্যে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধন-আশ্রমের পুণ্যব্রত স্বামীজি শ্রীমদ্ শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী মহাশয় অন্যতম,—তাঁর আশীর্বাদ আমাদের পরম সম্বল। ভক্তি-সুধাহার গলায় নিয়ে যিনি আমাদের ভক্ত ও ভগবানের সুধামাখা কথা শোনান, সেই পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের অনলস সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া আমরা এ পথে এক পা-ও অগ্রসর হতে পারতাম না—তাঁর কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। পিতৃঋণ শোধ করা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত, সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবার নেই। ভালবাসার দান মহামূল্যবান ; এমনি ভালবাসা পেয়েছি আমরা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাধনআশ্রমের শিল্পী-সাধক শ্রীসুধীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হতে—তাঁর অপার্থিব শিল্প-সাধনার পরিচয় আমাদের সকল প্রকাশন-প্রচেষ্টাতেই প্রস্ফুটিত কমলের মতো শোভা পাচ্ছে—এজন্য আমরা আমাদের ধন্য মনে করি।

'জিজ্ঞাসা-পুস্তকপ্রকাশন' কার্যালয়ের সকল কর্মীই আমাদের চলার পথে সর্ববিষয়ে সাহায্য করে আসছেন—ভগবান তাঁদের কল্যাণ করুন, এই প্রার্থনা। ইতি—

বিনীত
প্রকাশক

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

প্রস্তাবনা

আমাদের শাস্ত্রে কল্পতরুর কথা আছে। কল্পতরুর নিকট যা যাচ্ঞা করা যায় তা-ই পাওয়া যায়। কল্পতরু সকলেরই বাঞ্ছিত অভীষ্ট পূরণ করে থাকেন। ভগবানও ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। ভক্ত তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করেন তাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে কল্পতরুর একটা মস্ত পার্থক্য আছে। কল্পবৃক্ষের নিকট কিছু প্রার্থনা করতে হলে স্বয়ং তার নিকটে উপস্থিত হতে হয়, কিন্তু শ্রীভগবান আমাদিগকে প্রেমফল বিতরণ করার জন্যে স্বয়ং আমাদের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু সংসারের কোলাহলে তাঁর সে উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনতে পাই নে। তিনি আমাদিগকে বরদান করার জন্যে বাহু প্রসারণ করে রয়েছেন, কিন্তু বিষয়ের ধূলিজালে চক্ষু আমাদের অন্ধ বলে তা আমরা দেখতে পাই নে। তাই জীবের প্রতি পরম করুণা বশতঃ শ্রীভগবান যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নরবপুধারী ভগবানকে কি সবাই চিনতে পারে? গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥' ৯।১১

মূঢ়গণ মানবদেহধারী আমায় অবজ্ঞা করে, কারণ, আমিই যে সকল ভূতের ঈশ্বর, আমার এই প্রকৃষ্ট ভাবটি তারা জানে না।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন—আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে। এই ধর্মসংস্থাপনের উপায় হচ্ছে সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদের বিনাশসাধন। শ্রীভগবানের অবতরণের উপযুক্ত কাল যে সমুপস্থিত তা কেমন করে বুঝবো? যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হবে তখনই বুঝতে হবে ভূভার-হরণকারীর আগমনের আর বিলম্ব নাই।

উৎপীড়িতা ও নির্যাতিতা পৃথ্বীর ভার-হরণের জন্যে স্বয়ং ভগবান ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্ররূপে ও দ্বাপর যুগে বাসুদেব-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আবার

কলিযুগে যখন ভাগবত-ধর্ম বা ভক্তিধর্ম বিলুপ্তপ্রায়, ধর্ম যখন শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত, শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে যখন সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের হৃদয়বৃত্তির যোগসূত্র ছিন্ন, ভগবদ্বিমুখ শাস্ত্রপণ্ডিত-গণের বিদ্যার দম্ভ ও আভিজাত্যের গর্ব যখন আকাশচুম্বী, সেই সময়ে আমাদেরই এই বাংলাদেশে নাম-মাহাত্ম্য ও প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার ভাব-কান্তি নিয়ে নবদ্বীপ-ধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য, শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় ভগবান দুর্বৃত্তগণকে সংহার করতে আসেন নি, নাম-সংকীর্তন ও প্রেমফল-বিতরণের ভেতর দিয়ে পাপী-তাপীর হৃদয় শোধন করতে এসেছিলেন করুণাবতার শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ। তাঁরা দুজনেই—

'দয়াময় অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে,
হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে।'

অবশ্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে ভারত-ভূমে যখন ধর্মের গ্লানি হয়েছিল সেই সময়ে ভগবান তথাগত করুণাঘন মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেবারেও তিনি দুর্বৃত্তদের সংহার করেন নি; সাম্য, মৈত্রী ও করুণার আদর্শ প্রচার করেছিলেন, আর মানুষকে পরম মঙ্গলের পথ দেখিয়েছিলেন। জয়দেব গোস্বামী তাঁর দশাবতার স্তোত্রে বলেছেন—

'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।'

হে কেশব! পশুহিংসা-দর্শনে তোমার সকরুণ হৃদয় আর্দ্র হয়েছিল, বুদ্ধরূপে তুমি হিংসার দোষ প্রদর্শনপূর্বক (যুগপ্রয়োজনে) যজ্ঞবিধায়ক বেদবাক্যসমূহের নিন্দা করেছিলে, হে হরে! হে জগদীশ! তোমার জয় হোক।

কোমল-কান্ত পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্তক, মহাজন জয়দেব গোস্বামী

শ্রীগীতগোবিন্দে দশাবতারের বন্দনা করে নিম্নোক্ত শ্লোকে স্তব সমাপ্ত করেছেন—

'বেদান্ উদ্ধরতে, জগন্তি বহতে, ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যান্ দারয়তে, বলিং ছলয়তে, ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে, হলং কলয়তে, কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে, দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥'

হে হরে! মীনরূপে তুমি বেদসমূহ উদ্ধার করেছিলে, কূর্মরূপে তুমি পৃষ্ঠে ধরাকে ধারণ করেছিলে, বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে তুমি উত্তোলন করেছিলে, নৃসিংহ-মূর্তিতে তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেছিলে, বামন-অবতারে ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞার ছলে তুমি বলিরাজকে ছলনা করেছিলে, পরশুরাম-রূপে তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলে, শ্রীরামচন্দ্র-রূপে তুমি রাক্ষসরাজ রাবণকে সংহার করেছিলে, বলরামরূপে দুষ্টদমনের জন্যে হলধারণপূর্বক নানা অদ্ভুত লীলা করেছিলে, করুণাঘন বুদ্ধরূপে সর্বভূতে করুণা প্রদর্শন করেছিলে, আর কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণকে সংহার করেছিলে। হে কৃষ্ণ! দশবিধ লীলা তুমি প্রকটিত করেছ, তোমায় নমস্কার।

শ্রীভগবানের রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত, নাম অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্য অনন্ত, আবার তাঁর অবতারেরও সংখ্যা করা যায় না। জীবের প্রতি পরম করুণা বশতঃই তিনি নরদেহ ধারণ করেন। দণ্ডপ্রদানের ছলে তিনি দুর্বৃত্তগণের প্রতি পরম অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। ভবভূতির 'উত্তর-চরিত' নাটকে দেখি, শূদ্র তপস্বী শম্বুক শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়ে দিব্য পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। রামচন্দ্রকে প্রণাম করে তিনি বলেছিলেন—'সৎসঙ্গজানি নিধনান্যপি তারয়ন্তি', সাধু ব্যক্তির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হওয়াও কল্যাণের হেতু হয়ে থাকে। আবার দুর্বৃত্তদের বিনাশের দ্বারাই তো শ্রীভগবান ধর্ম-সংস্থাপন করে থাকেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর নারায়ণী-স্তুতি নামক একাদশ অধ্যায়ে দেবী স্বয়ং বলেছেন—

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥'

এমনি করে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবে বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রু অসুরগণকে সংহার করব।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, ভক্তের নিকট তিনিই ভগবান। জ্ঞানী বলেন, ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অগোচর, চক্ষু তাঁকে দর্শন করতে পারে না, মন তাঁকে মনন করতে পারে না, বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না। যোগী বলেন, ধ্যান বা সমাধির দ্বারাই সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ভক্ত বলেন, শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সীমা নেই, আনন্দঘন তিনি, লীলাময় তিনি, রসিক-শেখর তিনি, তাঁর নরবপুধারণের অন্যতম উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন। আচার্য শঙ্কর মায়াবাদী হয়েও অবতারবাদকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন—শ্রীভগবান জন্মরহিত (অজ), অব্যয়, ভূতগণের ঈশ্বর, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব, তথাপি নিজের মায়ার দ্বারা যেন নরবপু ধারণ করেন, যেন জন্ম-পরিগ্রহ করেন। নিজের কোনো প্রয়োজন না থাকলেও লোকানুগ্রহের জন্যেই তিনি এইরূপ লক্ষিত হন। কিন্তু ভক্ত জানেন—শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম সবই অলৌকিক। তাঁর লীলাশ্রবণে, তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য-স্মরণে আমরা ধন্য হই, পবিত্র হই, আমাদের অন্তর ভক্তিরসে সিক্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

'বাসুদেব-কথাপ্রশ্নঃ পুরুষান্ ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄন্ তৎপাদসলিলং যথা॥'

শ্রীভগবানের পাদসলিল যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তেমনি ভগবান বাসুদেবের কথা-প্রসঙ্গও তিন পুরুষকে পবিত্র করে। এই তিন পুরুষ কে? যিনি সে বিষয়ে বলেন, যিনি সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং যাঁরা শ্রদ্ধাভরে সে বিষয় শ্রবণ করেন। (ভগবানের পাদসলিল স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী ও পাতালে ভোগবতী এই ত্রিধারায় প্রবাহিতা)।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্'। অর্থাৎ, যাঁদের চিত্ত বিষয়ে বীতরাগ বা অনাসক্ত তাঁদের চরিত্র ধ্যান করলে আমাদেরও চিত্ত স্থির হয়। কিন্তু যাঁরা নরদেহধারী ভগবান, তাঁদের নাম-জপ ও লীলা কীর্তনে আমাদের শুধু চিত্তই স্থির হয় না, আমাদের হৃদয়ও ভক্তিরসে আর্দ্র হয়—শুধু তাই নয়, ভগবানে আমাদের রতি জন্মে এবং সেই রতি গাঢ় হলে প্রেমে পরিণত হয়।

যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যিনি নির্গুণ ও নিরাকার, সেই পরব্রহ্মকে আমরা অন্তরে ধারণা করতে পারি নে। সেই জন্যে আমাদের শাস্ত্র শ্রীগুরুকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজা করার ব্যবস্থা দিয়েছেন, 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ', আর সেইজন্যেই নরদেহধারী ভগবানের নাম, গুণ ও লীলাকীর্তন এবং তাঁদের লীলাভূমিতে বসতি ভক্তি-সাধনের প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'পরিপূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ হচ্ছে নরদেহধারী ভগবানে বিশ্বাস'। যাঁদের আমরা মহামানব বলি তাঁদের পূজা করেও আমরা নিজেরাই ধন্য হই। মানুষের মধ্যেই প্রথম ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। তাই আমাদের দেশে 'দীক্ষান্ত ভাষণে' আচার্য শিষ্যকে উপদেশ দিতেন—

'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।'

মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করবে। পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলে জানবে। আচার্যকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পূজা করবে। আর সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে অতিথির সেবা করবে।

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—এ তত্ত্ব আর্য ঋষিগণ জানতেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, সধবার পতিদেবতার উপাসনায় ও বিধবার ব্রহ্মচর্যে এই একই তত্ত্ব নিহিত।

আমরা যা বলছিলাম। নরদেহধারী ভগবানে বিশ্বাস এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা যে ভক্তি-সাধনার অঙ্গ, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক আচার্যগণ একবাক্যে সে কথা স্বীকার করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের তেইশ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, অক্ষয় সরোবর থেকে যেমন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলধারা নির্গত হয়, তেমনি সত্ত্বনিধি শ্রীহরি থেকেও অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া
হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ
সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥'

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলা হয়েছে—

'অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।'

মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ

এই অবতার অনন্ত, কিন্তু অবতারের ছয়টি প্রকারভেদ আছে।

'অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥'

ঐ, ঐ

ভূভার-হরণ ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে শ্রীভগবানের যে অবতরণ ও নরবপু-ধারণ তাকে বলে অবতার।[১] যিনি ঈশ্বরের অংশস্বরূপ, যিনি প্রকৃতির গুণকে আশ্রয় করে কার্য করেন ও বহু অবতারবিশিষ্ট হন, তাঁকে বলা হয় পুরুষ[২]। যিনি শুধু লীলা বা ক্রীড়ার জন্যে আবির্ভূত হন তাঁকে বলে লীলাবতার। শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতারেরও গণনা করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে লীলাবতারের কথাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'হে ঈশ্বর। তুমি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাজন্য অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র, বিপ্র অর্থাৎ পরশুরাম ও বামন প্রভৃতি রূপে বহুবার অবতীর্ণ হয়ে ত্রিভুবনকে রক্ষা করেছ'। যিনি প্রকৃতির গুণকে আশ্রয় করে অবতীর্ণ হন, তিনি গুণাবতার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বলা হয় গুণাবতার। তিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃজন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন ও রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলছেন—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিযুক্ত হয়েই আমি সৃষ্টি করি, তাঁর আদেশেই শিব সংহার করেন, আবার তিনিই বিষ্ণুরূপে অখিল বিশ্বকে পালন করেন।

প্রতি মন্বন্তরের অবতারকে বলা হয় মন্বন্তরাবতার। চতুর্দশটি মন্বন্তরে

---

১. সৃষ্টিহেতু যেই মূর্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্তি অবতার নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অধিষ্ঠান।
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ)

২. সঙ্কর্ষণ বা বলরাম হচ্ছেন পুরুষাবতার, তিনি ক্রিয়াশক্তিপ্রধান।

তাঁর চৌদ্দটি অবতার। আবার প্রতিযুগে ভগবান যুগাবতার-রূপে অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম প্রচার করেন। সত্যযুগের ধর্ম কৃষ্ণধ্যান, এই ধ্যানের ফলেই লোক জ্ঞানে অধিকারী হয়, ত্রেতাযুগের ধর্ম হচ্ছে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগের ধর্ম হচ্ছে কৃষ্ণপদার্চন, আর কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন। আমরা নানা পুরাণে কলিযুগের নানা দোষের কথা শুনতে পাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হয়েছে—

'কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥'

দোষসমূহের আধার হলেও কলিযুগের একটি মহান গুণ রয়েছে। এই যুগে যিনি শুধু কৃষ্ণের নামকীর্তন করেন তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হন ও পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করেন।

এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনের কণ্ঠে—

'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগ-সার।
হরিনাম-সংকীর্তন যাহাতে প্রচার ॥'

শক্ত্যাবেশাবতারসম্পর্কে 'লঘুভাগবতামৃতে' বলা হয়েছে—যে সকল শ্রেষ্ঠ জীবে ভগবান জ্ঞান বা শক্তির অংশের অংশ দিয়ে আবিষ্ট হন, তাঁদের বলা হয় শক্ত্যাবেশাবতার। সনক, নারদ, ব্রহ্মা, অনন্ত প্রভৃতি এরূপ অবতারের দৃষ্টান্ত। আমরা সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি, ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণ-শক্তি, পৃথুতে পালন-শক্তি ও পরশুরামে[১] দুষ্টদমনকারী বীর্যশক্তির প্রকাশ দেখতে পাই।

শ্রীভগবানের সকল লীলার মধ্যে নরলীলাই শ্রেষ্ঠ। নররূপ-ধারী ভগবানের গুণ ও লীলাকীর্তনের মধ্য দিয়েই আমরা পরম কল্যাণ লাভ করি।

যাঁরা যুক্তি-বিচারের পথে অগ্রসর হন তাঁরা এই লীলারস আস্বাদন করতে পারেন না। ভক্তিসাধনার প্রধান অঙ্গই হচ্ছে শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস। বিশ্বাসের শক্তি অপরিসীম, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। বিশ্বাসের গুণেই মানুষ সকল পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। দাস্যভাবের সাধক মহাবীরের (হনুমানজীর) ভেতর রামনামের শক্তিতে কী প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল! তিনি বলেছেন—

১. লীলাবতারের মধ্যেও পরশুরামের গণনা করা হয়েছে।

'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥'

শ্রীনাথ (লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু) ও জানকীনাথ (শ্রীরামচন্দ্র) স্বরূপতঃ অভিন্ন, তথাপি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব।

এ যুগে হয়ত অনেকে প্রশ্ন করেন—আমরা তো চতুর্দিকে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান দেখতে পাচ্ছি, কই শ্রীভগবান তো ধর্মসংস্থাপনের জন্যে নরদেহ ধারণ করে আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হচ্ছেন না? কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কি শ্রীভগবানের আবির্ভাবের জন্যে কাতর প্রাণে ক্রন্দন করছি? রাক্ষসরাজ রাবণের উৎপীড়নে যখন ত্রিভুবন কম্পিত সেই সময়ে স্বর্গে দেবতারা পরামর্শ করেছিলেন, কেমন করে এই দুর্ধর্ষ রাবণকে সবংশে নিধন করা যায়। ভারতের সনাতন ধর্মের রক্ষক ঋষি-সঙ্ঘ ও তাপসকুলও তখন রাক্ষস-নিধনের জন্যে নারায়ণের নিকট ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ আকুল প্রার্থনায়ই গোলোকবিহারী নারায়ণ বিচলিত হয়েছিলেন। আর তাঁদের প্রার্থনা-পূরণের জন্যেই স্বয়ং নারায়ণ ভূলোকে রাজা দশরথের গৃহে চারি অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন—

'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥
মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইতে প্রকাশ ॥
শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ ॥'

আবার দ্বাপর যুগের শেষে বলদৃপ্ত শক্তিমদমত্ত কংসের অত্যাচার যখন মাত্রাহীন হয়ে উঠেছে, যখন দিকে দিকে ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছে, তখন জননী ধরিত্রীর অন্তর থেকে এই ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল—হে গোলোকবিহারী, আমার ভার-হরণের জন্যে তুমি অবতীর্ণ হও। তাই, কংস-ধ্বংসকারী, দুষ্কৃতগণের বিনাশকারী, ভক্তগণের মনোহারী ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার যখন কলিযুগে সকল সংসার 'কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন' হয়েছিল, ধর্ম যখন শুষ্ক বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়েছিল, যখন নবদ্বীপ সমগ্র ভারতে বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র হলেও এবং নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন

ন্যায়শাস্ত্রের চর্চায় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিলেও ভগবদ্বিমুখ হয়ে পড়েছিল, সেই সময় অদ্বৈতাচার্যের আকুল ক্রন্দন, হুঙ্কার ও তর্জনে ক্ষীরোদসাগর-শায়ী নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। লোকের অবস্থাদর্শনে করুণহৃদয় আচার্য এই ভাবে বিচার করেছিলেন—

'কেহো পাপে, কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ॥

*　　*　　*

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার॥
শুদ্ধ ভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্তন-সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—'প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার', কিন্তু এও তো বহিরঙ্গ হেতু, তাঁর আবির্ভাবের মূল প্রয়োজন নয়। অবশ্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজন-সাধনের জন্যেই তিনি জীবভাব আশ্রয় করে জীবগণকে শিক্ষা দিয়েছেন, কারণ, 'আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়'। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে শ্রীমতী রাধার ভাব ও কান্তি লয়ে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হলেন তার মূল কারণটা কি? কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

'যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেম নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

* * *

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥
আপনারে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সর্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥'

(আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

কিন্তু এই যে অকৈতব প্রেম বা শুদ্ধা ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তি, সে তো আমাদের পক্ষে সহজলভ্য নয়। ভক্তি সাধনারও যে একটা ক্রম আছে, শ্রীরূপ গোস্বামী তা প্রদর্শন করেছেন তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামক গ্রন্থে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, নামে যাঁর রুচি জন্মেছে, তিনি একদিন ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হবেনই। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলেন, নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। কিন্তু ভক্ত বলেন, শ্রীভগবানের নাম সত্য; কেননা, নাম আর নামী হচ্ছেন অভিন্ন, আর তাঁর শ্রীবিগ্রহও সত্য ও নিত্য বস্তু। শ্রীভগবানের দেহ নাই, এ কথা সত্য নয়; তাঁর দেহ হচ্ছে অপ্রাকৃত, চিন্ময়।

কলিযুগে সংকীর্তন-যজ্ঞে যাঁরা শ্রীভগবানের আরাধনা করেন, শাস্ত্রে তাঁদের বলা হয়েছে সুমেধা অর্থাৎ বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ, তারকব্রহ্মনাম-জপ ও নাম-সংকীর্তনই যে কলিযুগে যুগধর্ম, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন। শ্রীভগবানের নাম অনন্ত, আর প্রত্যেকটি নামেই তিনি নিজের শক্তি সঞ্চার করে রেখেছেন, তথাপি 'হরি,' 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' নাম যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাতে সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্বেই বলেছি—ধ্যান, যজ্ঞ, সেবা ও নামকীর্তন হচ্ছে যথাক্রমে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের যুগধর্ম। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি—যিনি সকলের হৃদয় হরণ করেন বা ভক্তগণের পাপ-তাপ হরণ করেন তিনি হচ্ছেন হরি, যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন বা সকলের পাপ কর্ষণ

করেন তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ (ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ), আর যিনি ভক্তজনের সঙ্গে রমণ বা ক্রীড়া করেন তিনি হচ্ছেন রাম। শাস্ত্রে 'হরি' কথাটির আর একটি তাৎপর্য বিবৃত হয়েছে[১]—

'রুদ্ররূপেণ সংহর্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্তিতঃ॥'

ভক্তগণের পালক হয়েও ভগবান নিত্যই জগৎসমূহের সংহার করে থাকেন, তাই তিনি হরি শব্দে কীর্তিত হন। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—একবার হরিনাম উচ্চারণ করলেই চতুর্বেদ-পাঠের ফল লাভ হয়, আর অজ্ঞ ব্যক্তিও হরিনাম উচ্চারণ করলে তাঁর সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে যায়।

আবার 'কৃষ্ণ' শব্দের তাৎপর্য শাস্ত্রে এই ভাবে বিবৃত হয়েছে—

'কৃষিরুৎকৃষ্টবচনো ণশ্চ সদ্ভক্তিবাচকঃ।
অশ্চাপি দাতৃবচনঃ কৃষ্ণং তেন বিদুর্বুধাঃ॥'

'কৃষ্‌' কথাটি হচ্ছে উৎকর্ষবোধক, ণ শব্দটি হচ্ছে সদ্ভক্তির বাচক, আর অ শব্দটির দ্বারা দাতাকে বোঝাচ্ছে। অতএব 'কৃষ্ণ' কথাটির দ্বারা বুঝতে হবে—যিনি উৎকৃষ্ট ভক্তি দান করেন।

(শ্রীকৃষ্ণ কথাটির আরও বহুবিধ ব্যাখ্যা আছে। এ বিষয়ে শ্রীজীব গোস্বামীকৃত ব্রহ্মসংহিতার টীকা দ্রষ্টব্য।)

'রাম' শব্দের তাৎপর্য, যথা—

'রা শব্দো লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবোধকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥'

'রা' শব্দের দ্বারা লক্ষ্মীকে বোঝায়, আর 'ম' শব্দ হচ্ছে ঈশ্বরের বোধক। তাই মনীষিগণ বলেছেন, লক্ষ্মীপতি ভগবান রামচন্দ্রই মানুষের গতি।

বিভিন্ন পুরাণে রামনামের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। ভক্ত কবি তুলসীদাসের অমর কাব্য 'রামচরিত-মানসে' রামচরিতের মাহাত্ম্য যে ভাবে কীর্তিত হয়েছে, তা পাঠ করে পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তিরসে আর্দ্র হয়। ভক্ত

১. পথের আলো, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৭৬, পণ্ডিত শ্রীজীবনকৃষ্ণ তর্কতীর্থ-রচিত 'শ্রীহরিনামসাধন' শীর্ষক প্রবন্ধ।

কবি পুনঃ পুনঃ এই কথা ঘোষণা করেছেন যে রাম-নাম রাম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ—

রাম এক তাপস-তীয় তারী।
নাম কোটী-খল-কুমতি সুধারী॥
ভজেউ রাম-আপু ভব-চাপূ।
ভবভয়-ভঞ্জন নাম প্রতাপূ'॥

শ্রীরামচন্দ্র (অহল্যানাম্নী) এক্ তাপস-নারীকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম কোটি কোটি খল ও কুবুদ্ধিকে ত্রাণ করেছে। রাম হরধনু নামে একটি ধনু ভঙ্গ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নামের এমনি প্রতাপ যে তাতে ভবভয় ভেঙ্গে যায়।

আবার তিনি বলেছেন—রামচন্দ্র শুধু রাক্ষসগণকে বধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নাম কলির কলুষরূপ সকল রাক্ষসকে বধ করে।

অখিলরসামৃত সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং', তিনি অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন রূপে তিনি প্রকাশিত হন। আমরা বলেছি, তাঁর নাম অনন্ত, রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্য অনন্ত। তাঁর লীলা নিত্য, প্রকট লীলায় তিনি দুর্বৃত্তের দমনকারী, কুরুক্ষেত্র-সমরে পাঞ্চজন্যের সিংহনাদকারী, শরণাগতা দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণকারী বৃন্দাবনবিহারী, গোপীজনমনোহারী। আবার তিনিই যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন ও নিজরসাস্বাদনের জন্যে শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ। বাংলার মহাজন গেয়েছেন—

'যদি গৌর না হইত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
ভূতলে জানাত কে॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, (১) 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস', (২) ভগবান ভক্তির বশীভূত, সুতরাং কর্ম, জ্ঞান ও যোগের পথ পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগে তাঁর ভজনা করবে (৩) প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ আর কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই প্রেম (৪) যেখানে মোক্ষবাঞ্ছা সেখানে কৃষ্ণভক্তি নেই আর সর্বোপরি (৫) 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা'।

আমরা এখন ভক্তগণের পূত পদরজ মস্তকে ধারণ করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীগৌরচন্দ্রের চরিত্র-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। এই তিন পূর্ণশশী আমাদের অন্ধকার হৃদয়-গুহায় তাঁদের স্নিগ্ধ শুভ্র রশ্মিজাল বিকিরণ করুন।

ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

অভিরাম রামচন্দ্র, রামভদ্র, বেধা সারাৎসার।
রঘুনাথ, ওহে নাথ, সীতাপতি, করি নমস্কার॥

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরম্।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্মিকম্॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥

রাম রঘুবর যিনি লক্ষ্মণ-অগ্রজ সীতাপতি,
ককুৎস্থের বংশধর, কৃপাময়, সুন্দরমূরতি।
গুণনিধি, বিপ্রপ্রিয়, ধর্মশীল সতত যে জন,
রাজেশ্বর সত্যসন্ধ, শান্তমূর্তি শ্যামলবরণ।
বন্দি সে লোকাভিরাম দশরথ-নৃপ-তনয়েরে,
বন্দি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাবণ-অরাতি রাঘবেরে।

(অনুবাদ : আশালতা সেন)

রাম রামেতি রামেতি কূজন্তং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়-কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্॥

রাম, রাম, রাম রবে কবিতা-শাখায় বসি যাঁর,
মধুর কূজন, সেই বাল্মীকি-কোকিলে নমস্কার।

(অনুবাদ : আশালতা সেন)

তুলসী-কৃত রামচরিতমানস হইতে,

সীতারাম-গুণগ্রাম-পুণ্যারণ্য-বিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ॥

আমি কবীশ্বর বাল্মীকি ও কপীশ্বর হনূমানের বন্দনা করি, তাঁরা দু'জনেই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানরূপ এবং দু'জনেই সীতারামের গুণগ্রামরূপ পুণ্যারণ্যে বিহার করেছেন।

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্॥

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী, ক্লেশহারিণী মঙ্গলদায়িনী রামবল্লভা সীতাকে নমস্কার করি।

বন্দে রামাখ্যং হরিম্

যন্মায়াবশবর্তী বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা
যৎসত্ত্বাদমৃষেব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ।
যৎপাদপ্লব এক এবহি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্ ॥

এই নিখিল বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর মায়ার বশীভূত, যাঁর সত্ত্ব থেকে উৎপন্ন এই সংসার অনিত্য হলেও রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো নিত্য বলে বোধ হয়, যাঁর পাদপ্লব (চরণরূপ ভেলা) ভবসমুদ্র পার হবার একমাত্র উপায়, যিনি অশেষ কারণেরও উর্দ্ধে অবস্থিত, সেই রামাখ্য (রামনামধারী) হরিকে প্রণাম করি।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য চরিত-কথা আলোচনার পূর্বে কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির চরণ বন্দনা করি, যাঁর রচিত অমর মহাকাব্য সম্পর্কে স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বলেছিলেন—

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে
তাবদ্রামায়ণী কথা ভূতলে প্রচরিষ্যতি ॥'

'যতকাল নদীগিরি ধরাতলে রবে অবস্থিত।
রামায়ণ-কথা তব ততকাল রবে প্রচারিত ॥'[১]

মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ (ও মহর্ষি বেদব্যাস-রচিত মহাভারত) একাধারে মহাকাব্য, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র ; পুণ্যসলিলা জাহ্নবী-যমুনা যে দেশের প্রবাহিনী, ধ্যানমগ্ন দেবতাত্মা হিমালয় যে দেশের পর্বত, যে দেশের অগণিত তীর্থ মুনি-ঋষিগণের দ্বারা অধ্যুষিত, সেই দেশেই এমন দু'খানি মহাকাব্য রচিত হওয়া সম্ভবপর। এই দু'খানি মহাকাব্য-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

---

১. শ্রীমতী আশালতা সেনের বাল্মীকি রামায়ণ থেকে এই পদ্যানুবাদগুলি উদ্ধৃত।

ভারতবর্ষের যা সাধনা, যা আরাধনা, যা সঙ্কল্প, তারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান। (রামায়ণী কথার ভূমিকা)।

আমরা রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখতে পাই, মহর্ষি বাল্মীকির মনোভূমিতেই প্রথমে এমন এক দেব-মানব বা লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁর মতো বহুগুণসম্পন্ন নরচন্দ্রমা সংসারে দুর্লভ, দেবতার চাইতেও যিনি বড়ো, আর যাঁর চরিত্রের ধ্যান করলে মানুষ হয়ে ওঠে দেবতা। একদিন তপস্বী, স্বাধ্যায়-নিরত, বেদবিদ্ মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন—

কো ন্বস্মিন্ প্রথিতো লোকে সদ্‌গুণৈর্গুণবত্তমঃ।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
উদারাচারসম্পন্নঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।
বীর্যবাংশ্চ বদান্যশ্চ কশ্চাপি প্রিয়দর্শনঃ॥
জিতক্রোধো মহান্ কশ্চ ধৃতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
সঞ্জাতরোষাৎ কস্মাচ্চ দেবতা অপি বিভ্যতি॥
কঃ উদারঃ সমর্থশ্চ ত্রৈলোক্যস্যাপি রক্ষণে।
কঃ প্রজানুগ্রহরতঃ কো নিধির্গুণসম্পদাম্॥
সমগ্রারূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।
অনিলানল-সূর্যেন্দু-শক্রোপেন্দ্রসমশ্চ কঃ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তো নারদ তত্ত্বতঃ।
দেবর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥'

'সদ্‌গুণেতে ভূবিখ্যাত গুণিশ্রেষ্ঠ হন কোন্ জন,
ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ যিনি, দৃঢ়ব্রত, সত্যপরায়ণ।
সর্বভূতহিতে রত, সতত উদার ব্যবহার,
কে সে প্রিয়দরশন, কে বদান্য বীরত্ব-আধার।
ক্রোধজয়ী কে মহান, ধৈর্যশালী অসূয়া-রহিত,
রোষাবিষ্ট হলে কে বা দেবতাও হন ভয়-ভীত॥
ত্রিভুবন-সংরক্ষণে কে সমর্থ, কেবা সে উদার
প্রজা-অনুগ্রহে রত, গুণ আর সম্পদ-আধার।

আশ্রিতা সমগ্ররূপে কার লক্ষ্মী, কে নরপ্রধান,
অনিল-অনল-সূর্য-ইন্দু-ইন্দ্র-উপেন্দ্র সমান।
দেবর্ষি, বাসনা মম তব পাশে শুনিতে সে কথা,
রয়েছে শকতি তব জানিতে যে তাঁহার বারতা।'

মহর্ষি বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি বললেন—

'বহু সুদুর্লভ গুণ কীর্তন করিলে তুমি এবে,
দুর্লভ এ নরলোকে এত গুণ একটি মানবে।
দেবতাগণেও নাহি এত গুণ করি নিরীক্ষণ,
আছেন এ হেন তবু গুণাধার নর একজন।
মহাদ্যুতিময় আর এতাধিক গুণে গুণবান্,
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম, গুণাধার রাম তাঁর নাম।'

তারপর দেবর্ষি বললেন—

'সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে স্থৈর্যে চ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ॥
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যেঽপ্যস্থপমঃ সদা॥
রময়ত্যেব স গুণৈরুদারৈস্তৈরিমাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদতো রাম ইতি নাম্নৈতত্তস্য বিশ্রুতম্॥'

'গাম্ভীর্যে সমুদ্রসম, স্থৈর্যে যেন গিরি হিমবান্,
বীর্যেতে বিষ্ণুর সম, সৌন্দর্যেতে চন্দ্রের সমান।
কালাগ্নিসদৃশ ক্রোধে, পৃথিবীর তুল্য ক্ষমাগুণে,
কুবেরের সম ত্যাগে, অনুপম সত্য-সংরক্ষণে॥
করি রাম মনোরম হেন বহু উদার গুণেতে,
রঞ্জন প্রজার মন, রাম নামে বিখ্যাত জগতে।'

ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি নর-নারী শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান-জ্ঞানে পূজা করেছেন, রামনাম জপ করে কত সাধু-সন্ত সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখনও প্রতিদিন অগণিত নর-নারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—

'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।'

আর স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে যে তারকব্রহ্ম-নাম-কীর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।'

শাস্ত্রে 'ভগবান' শব্দের লক্ষণ হচ্ছে—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥'

অর্থাৎ সমগ্র 'ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি যাঁর ভেতর পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান। আবার ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥'

সংসারে যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, সমৃদ্ধিমান এবং বল ও উদ্যমশালী, সকলই আমার শক্তির অংশ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে।

অবতার-পুরুষগণের জন্ম ও কর্ম সকলই দিব্য ও অলৌকিক, সুতরাং তাঁদের পরিচয় পেতে জ্ঞানিগণের বিলম্ব হয় না,—এ বিষয়ে তাঁদের বুদ্ধি কখনও বিভ্রান্ত হয় না। তাই শ্রীরামচন্দ্র যুগ যুগ ধরে আমাদের দেশে অবতাব-রূপেই পূজিত হয়ে আসছেন। ঋষি-কবি বাল্মীকি, ভক্তকবি কৃত্তিবাস ও সাধক-কবি তুলসীদাস সকলেই অমৃতময়ী রামচরিত-কথা বর্ণনা করে ধন্য হয়েছেন। কৃত্তিবাসের দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অংশ, আর তুলসীদাসের উপাস্য দেবতাই হচ্ছেন নরবপুধারী শ্রীরামচন্দ্র; মহর্ষি বাল্মীকি কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে মহামানব বা লোকোত্তর পুরুষরূপেই চিত্রিত করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'রামায়ণ নরচন্দ্রমার কথা', যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে রামচন্দ্র 'একই কালে আমাদের নিকট দেবতা এবং মানুষ' ('রামায়ণী কথার' ভূমিকা)। কিন্তু যাঁরা মহর্ষি-রচিত রামায়ণ আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন, তাঁরা উপলব্ধি করবেন—শ্রীরামচন্দ্র যে বিশেষ যুগ-প্রয়োজনে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর সে প্রয়োজন হচ্ছে ঋষিগণের তপোবিঘ্নকারী দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণকে, বিশেষতঃ, ঐশ্বর্যমদমত্ত বলদৃপ্ত রাবণকে সংহার করে, শিষ্ট ও অনুগতগণকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত

করে সর্বত্র দৈবী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করা—শ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসন ও তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মণ ও সীতার বনে গমন হচ্ছে তার একটা উপলক্ষ্য মাত্র। এইখানেই শ্রীরামচন্দ্রের চরিত-মাহাত্ম্য, আবার তিনি গৃহধর্ম ও রাজধর্মের আদর্শ, ক্ষাত্রতেজ ও বীর্যের, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের, মৈত্রী ও করুণার আদর্শ। এই রামনামের গুণেই কত পাপী-তাপী উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে, রাম-সীতার উপাসনা কত ক্ষুদ্রকে মহৎ করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়, যেখানে মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করছেন—

'ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহো মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।'

সেখানে কিন্তু কবি রাম-নামের অলৌকিক মাহাত্ম্যকে স্বীকৃতি দান করেছেন।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' মূল রামায়ণের কাহিনী বা ভাবধারার অনুসরণ মাত্র নয়, তাই কবির প্রজ্ঞা ও প্রতিভার দীপ্তিতে কবিতাটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কবিতায় মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করছেন—

'কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা-মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে, সর্বদর্শি হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'

তখন—

নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'

সকলেই জানেন, রামায়ণের নায়ক হচ্ছেন রঘুবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র, আর নায়িকা লক্ষ্মীরূপিণী সীতা। শাক্ত সাধকের দৃষ্টিতে এই রামচন্দ্র ও সীতাদেবী শিব ও শক্তির সহিত অভিন্ন। আবার কবি ভবভূতির দৃষ্টিতে শ্রীরাম একজন লোকোত্তর পুরুষ,—বজ্রের চাইতেও কঠোর, আবার কুসুমের চাইতেও কোমল।

তবে, ভবভূতি এ কথাও বলেছেন যে, লোকোত্তর পুরুষগণের চরিত্র আমাদের নিকট দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য।

শ্রীরামচন্দ্র নরবপুধারী ভগবান, তিনি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব, তাই তাঁকে বাল্যকালেই ভ্রাতৃগণের সঙ্গে শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি শস্ত্রবিদ্যায় কি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশ্বামিত্রের নির্দেশে তাড়কা রাক্ষসী ও রাক্ষসবাহিনীর সংহারে, সীতার স্বয়ংবর-সভায় হরধনুর্ভঙ্গে, এবং পরশুরামের সহিত সংগ্রামে ও বিষ্ণুধনুর্ভঙ্গে। তাড়কা-নিধনের পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র ক্ষাত্রধর্ম শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন—'রাজ্যরক্ষার গুরু ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁদের প্রজারক্ষণের জন্য শুধু অনৃশংস কর্ম নয়, নৃশংস ও দোষযুক্ত কর্মও করতে হবে, আর এটাই হচ্ছে ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সনাতন ধর্ম।' এখানে কিন্তু বিশ্বামিত্র উপলক্ষ্য মাত্র, ধর্মসংস্থাপনের জন্যেই শ্রীরামচন্দ্রকে কিশোর বয়সে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল। ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁকে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান করেছিলেন।

শ্রীভগবান শরণাগতবৎসল। দুরাচার ব্যক্তিও যদি তাঁর শরণাগত হয়ে অনন্যচিত্তে তাঁর ভজনা করেন, তবে তিনি তাঁকে উদ্ধার করেন। গৌতমপত্নী অহল্যা যখন ধ্যানমগ্না, রামনাম জপে আত্মসমাহিতা ও রামচন্দ্রের আগমনের জন্যে প্রতীক্ষমাণা, তখন রামচন্দ্র এসে তাঁর উদ্ধারসাধন করেন। মহর্ষি বাল্মীকিও শ্রীরামচন্দ্রের এই সব অতি-মানুষী লীলার বর্ণনা করেছেন। (অবশ্য, শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে পাষাণী অহল্যার মানবী-রূপে পরিণতির কাহিনী ঋষি-প্রোক্ত রামায়ণে নেই, আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে)। সুতরাং মহর্ষি বাল্মীকির দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র শুধুই নরচন্দ্রমা, এমন কথা বলা চলে কি না, তা বিচার্য।

এ বিষয়ে মূল রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশ্বামিত্রের উক্তি উদ্ধৃত হচ্ছে—

'নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ।
পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা।
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষো ধর্মঃ সনাতনঃ॥'

বিশ্বামিত্র স্বয়ং ক্ষত্রিয় ও রাক্ষসবধে সমর্থ হয়েও তপস্বীর ব্রত অবলম্বন করেছিলেন এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই ক্রূরকর্ম বা হিংসাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত হন নি। তিনি রাম-লক্ষ্মণের বল-বিক্রমের কথা জানতেন বলেই

তাঁদের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের সংহারে নিযুক্ত করেছিলেন। তাড়কা, রাক্ষসীর নিধনে ও সনাতনধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ক্রূরকর্মা রাক্ষসকুলের হারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে অমোঘ বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই বীর্যই পরে নিয়োজিত হয়েছিল ভূভার-হরণে ও ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনে এবং সমগ্র ভারতব্যাপী এক অখণ্ড রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায়। (ভগবান রামচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন রাজ্যকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছিলেন)। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন ও রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, এ সব ঘটনা তো উপলক্ষ্য মাত্র।

লক্ষ্মীরূপিণী সীতা যে চিরদিনই শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মচারিণী হবেন, সম্পদে, বিপদে সর্বদা যে ছায়ার ন্যায় তাঁর অনুগমন করবেন, কন্যাসম্প্রদান-কালেই রাজর্ষি জনক এই কথাগুলি রামকে বলেছিলেন এবং তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল। হর-গৌরীর ন্যায় সীতা-রামও আমাদের দেশে দাম্পত্যজীবনের আদর্শ। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পতি, আদর্শ সখা, আদর্শ প্রভু ও আদর্শ রাজা। শ্রীরামচন্দ্র শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, তিতিক্ষু, কায়মনোবাক্যে সংযত, তিনি মনের দ্বারাও কখনও পাপাচরণ করেন নি, এক মুহূর্তের জন্যেও অপর কোনো নারী তাঁর অন্তরে স্থান পেয়েছে, এমন কোনো অপবাদ তাঁর কোনো শত্রুও দিতে পারে নি। গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ যে কত মহান, কত সমুচ্চ হতে পারে, কতটা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দ্বারা সমুজ্জ্বল হতে পারে, স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করে সেই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসনকে কেন্দ্র করে মহর্ষি তাঁর নিপুণ তুলিকায় দশরথ, কৈকেয়ী, কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কিত করেছেন। রামায়ণ করুণরসাত্মক মহাকাব্য আর এই করুণ-রসের সূচনা হয়েছে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে। একদিন পুণ্যসলিলা তমসার তীরে ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে থেকে নিষাদের শরে নিহত ক্রৌঞ্চটিকে দর্শন করে এবং ক্রৌঞ্চীর করুণ বিলাপ শ্রবণ করে মহর্ষি করুণাবিষ্ট হয়েছিলেন এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার ইচ্ছায় তাঁর শোক অভিনব ছন্দরূপে তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল। পরে তিনি ব্রহ্মার আদেশে এই অভিনব ছন্দে স্বয়ং অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়ে করুণরসাত্মক রামচরিত-কথা রচনা করেছেন, তাই এই

রামায়ণী কথা পাঠ বা শ্রবণ করে ভারতের অগণিত নরনারী যুগ যুগ ধরে অশ্রু বিসর্জন করেছে। বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাঁহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তাঁর নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।'

ধূপ যেমন স্বয়ং অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে সুগন্ধ বিতরণ করে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিগণ তেমনি স্বয়ং দুঃখানলে দগ্ধ হয়ে সহৃদয় পাঠকগণকে আনন্দ দান করেন। মহর্ষি বাল্মীকির অন্তরে ছিল সীমাহীন করুণা, যে করুণা সকল মানুষকে অতিক্রম করে তির্যক-যোনিতেও প্রসারিত হয়েছে—তাই করুণরস-সৃষ্টিতে মহর্ষি অদ্বিতীয় আর এই করুণরসের মহাকাব্যই তো যুগ যুগ ধরে আমাদের নয়ন অশ্রুসিক্ত ও হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত করছে।

শ্রীভগবান যখন নরবপু ধারণ করেন, তখন তিনি লোকশিক্ষার জন্যে নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন করে মানুষী লীলার অনুসরণ করেন। তিনি নররূপী দেবতা বলেই তাঁর চরিত্র বহুলাংশে বা কিয়দংশে মানুষের অনুকরণযোগ্য হয়। রামচন্দ্র যদি সকল অবস্থায় সুখে-দুঃখে নির্বিকার হতেন, রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণের পরেও যদি তিনি স্থির, অচঞ্চল চিত্তে শুধু কর্তব্যের অনুরোধেই দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণ ও লঙ্কার অধীশ্বর রাবণকে বধ করে সীতার উদ্ধার সাধন করতেন, তবে তাঁকে আমরা দূর থেকে নমস্কার করতাম, তাঁকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম না। এই জন্যে যে রামচন্দ্র কৈকেয়ীর মুখে রাজা দশরথের মনোগত (?) অভিপ্রায় অবগত হয়ে বলেছিলেন—'রাজার আদেশে আমি নির্বিকার চিত্তে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে পারি, বিষ ভক্ষণ করতে পারি, সাগর-গর্ভে প্রবেশ করতে পারি,' সেই রামচন্দ্রই জননী কৌশল্যার নিকট অপ্রিয় সংবাদ নিবেদন করতে গিয়ে প্রাকৃত জনের মতো বিচলিত হয়েছিলেন।

যখন ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ও পতিপরায়ণা সীতা বনবাসে শ্রীরামের অনুগমন করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন, তখন রামচন্দ্র তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হন নি। কারণ, দুষ্কৃত রাক্ষসগণের বিনাশ,

সনাতন ধর্মের রক্ষণ ও রাবণ-নিধনের জন্যেই শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তার জন্যেই লক্ষণ ও সীতার বনগমনের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁরা দু'জনেই স্বেচ্ছায়, সানন্দে বনবাসরূপ ক্লেশকে বরণ করেছিলেন।

রামচন্দ্রের চরিত্রে বজ্রের কঠোরতা ছিল বলেই মৃত্যুপথযাত্রী দশরথের একটি অন্তিম অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন নি, পুরবাসিগণের প্রার্থনা, ঋষিগণের অনুরোধ, বিদায়কালে সুমন্ত্রের বিলাপ, কিছুই তঁকে বিচলিত করতে পারে নি; অথচ যখন অরণ্যানী-মধ্যে বৃক্ষমূলে তৃণশয্যায় রামচন্দ্রকে প্রথম রজনী যাপন করতে হয়েছিল, তখন তিনি ধৈর্যহীন, ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। সত্যি নরবপুধারী ভগবানের কর্ম দিব্য হয়েও নরোচিত।

ভরতের মুখে রাজা দশরথের মৃত্যুবার্তা-শ্রবণেও শ্রীরাম বিশেষ ব্যাকুল হন নি, তিনি পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করে ভরতকে জীবন ও জগতের অনিত্যতা-সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন ভরত বলেছিলেন—'ধন্য তুমি! দুঃখেও তোমার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেও তোমার স্পৃহা নেই।' কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, শ্রীরামচন্দ্র সর্বত্র স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী নন, তিনি প্রবল অধ্যবসায়শীল ও কর্তব্যপালনে অবিচল হয়েও আমাদেরই মতো হর্ষ-বিষাদের অধীন, তাই তাঁর চরিত্র এমন গভীরভাবে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

যে ভ্রাতৃবৎসল ভরত নন্দীগ্রামে রাজসিংহাসনের উপর শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা-যুগল স্থাপন করে তাঁরই প্রতিনিধি-রূপে চতুর্দশ বৎসর রাজ্যশাসন করেছিলেন, তাঁকে রাজধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন কে? কয়েকটি উপমার সাহায্যে নীতি-শাস্ত্রবিদ্ শ্রীরামচন্দ্রই ভরতকে রাজধর্ম-সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

(১) রাজাকে প্রজাগণের কাছ থেকে কর গ্রহণপূর্বক অর্থ সঞ্চয় করতে হবে।

(২) প্রজাগণের কল্যাণের জন্যে রাজাকে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে দান করতে হবে।

(৩) বিশ্বস্ত চরের নিয়োগের দ্বারা রাজাকে রাজ্যের সকল সংবাদ আহরণ করতে হবে। রাজা হবেন চার-চক্ষু অর্থাৎ গুপ্তচর-রূপ চক্ষুর দ্বারাই তিনি দর্শন করবেন।

(৪) রাজাকে বিচারে শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী হতে হবে, প্রিয় ও অপ্রিয়কে তিনি তুল্য জ্ঞান করবেন।

(৫) যারা রাষ্ট্রদ্রোহী, দুষ্ট ও দুর্নীতিপরায়ণ, রাজা তাদের অপরাধ অনুসারে দণ্ডবিধান করবেন ; কারণ, এই দণ্ডনীতিই রাজ্যস্থিতির মূল।

(৬) রাজার একটি প্রধান কর্তব্য হচ্ছে প্রজারঞ্জন, তিনি প্রজাগণের আনন্দবর্ধনের জন্যেই সর্বদা যত্নবান হবেন।

(৭) শুধু প্রজারঞ্জন নয়, প্রজারক্ষণও যে একটি প্রধান রাজধর্ম, এটিও স্মরণ রাখতে হবে।

(৮) রাজা কর্তব্য-সম্পাদনে সর্বদা অবহিত হবেন। অমাত্য, সুহৃদ ও মন্ত্রিগণকেও তিনি যথাযোগ্য কর্মে প্রবর্তিত করবেন।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে আমরা একদিকে পাই, প্রাচীন ভারতের শান্ত-রসাস্পদ স্নিগ্ধ তপোবন ও কঠোরতপা সংযতাত্মা ঋষিগণের চিত্র, অপর দিকে পাই সনাতন ধর্মের বিঘ্নকারী নানা রক্ষেসের কাহিনী। অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র ক্ষাত্রধর্মের প্রতিমূর্তি, ঋষিগণের অনুরোধে তিনি রাক্ষসকুলের সংহারকার্যে রত,—সুতরাং বনবাসী হয়েও তিনি রাজধর্মই প্রতিপালন করেছেন। সীতা যখন শ্রীরামচন্দ্রকে হিংসা ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন রাম বলেছিলেন—'আমি তোমাকে, লক্ষ্মণকে, এমন কি, নিজের দেহ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু আমার শরণাগত ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণকে দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা না করে পারি নে'।

আমরা অরণ্যকাণ্ডে কত ঋষি ও তপস্বীর আশ্রমের পরিচয়ই না পাই! মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের ও শরভঙ্গের আশ্রম, মহামুনি অগস্ত্যের আশ্রম, ভরদ্বাজ ও মতঙ্গমুনির আশ্রম প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন ভারতের গৌরবময় দিনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

> 'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
> প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
> প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
> জ্ঞান-ধর্ম কত কাব্যকাহিনী।'

অরণ্যকাণ্ডে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদন, রাম কর্তৃক চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস-নিধন, মারীচের স্বর্ণমৃগের রূপ-ধারণ ও রাম-লক্ষ্মণকে

বঞ্চনা, এবং রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ,—সবংশে রাবণের নিধনের জন্যেই এই ঘটনাগুলি ছিল অনিবার্য। নতুবা ভগবান রামচন্দ্রকে বঞ্চিত করে, সংসারে এমন সাধ্য আছে কার? মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র আত্মকর্ম-সমর্থনের জন্যে গান্ধারীকে বলেছিলেন—'স্বর্ণমৃগের জন্ম অসম্ভব, তথাপি রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগের প্রতি লুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ, বিপৎকাল যখন আসন্ন হয়, তখন প্রায়শঃ পুরুষের বুদ্ধি মলিন হয়'। ভগবান যদিও নিয়তির স্রষ্টা, তথাপি নরদেহধারী ভগবান লোকহিতার্থে স্বেচ্ছায় নিয়তির অধীন হন।

সীতাকে উদ্ধারের জন্যেই জটায়ু রাবণের সঙ্গে প্রাণপণ বলে যুদ্ধ করে অবশেষে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। রাবণের প্রতি মুমূর্ষু জটায়ুর উক্তিটি সমগ্র রামায়ণ কাব্যের মূলসূত্র—

'ন তু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্।
কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে॥'

দুষ্ট বা অবিনীত (উদ্ধত) কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ দেখা যায় না। বীজ বপন করে যেমন পক্ক শস্যের জন্যে কালের প্রতীক্ষা করতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তেমনি কালই অঙ্গীভূত হয়।

রিপুজয়ী রামচন্দ্রের পত্নীপ্রেমও ছিল অসাধারণ। এই পত্নীপ্রেমে স্ত্রৈণ স্বভাবের পরিচয় নেই, আছে অমোঘ বীর্যের নিদর্শন। তিনি লক্ষ্মণকে বলেছিলেন —'বিষয়কর্মে সীতা আমার মন্ত্রী অর্থাৎ পরামর্শদাত্রী, সেবাকর্মে সীতা আমার দাসী। আবার সীতা আমার সহধর্মচারিণী,—তিনি ধরিত্রীর মতোই ক্ষমাশীলা বা সর্বংসহা। স্নেহে সীতা আমার জননী, অবার তিনিই আমার নর্মসখী'।

অরণ্যকাণ্ডের আরও দুটি দৃশ্য অবিস্মরণীয়। একটি হচ্ছে—ভগবান রামচন্দ্রে হস্তে কবন্ধ-রাক্ষসের নিধনপ্রাপ্তি, তার শাপমুক্তি, দিব্যদেহ-লাভ ও রাবণবধের উপায়-কথন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—মতঙ্গ মুনির শিষ্যা এবং রামচন্দ্রের দর্শনলাভের জন্যে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষমাণা তপস্বিনী শবরীর কাহিনী। রামচন্দ্রকে যথাবিধি পূজা করে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন এবং অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেছিলেন। শবরীর কাহিনী থেকে এই উপদেশই আমরা লাভ করতে পারি যে শ্রীভগবান ভক্তবৎসল;—তাঁর কাছে হীন, পতিত বা অস্পৃশ্য বলে কেউ নেই, যে অনন্যচিত্তে ভগবানের ভজনা করে বা তাঁর শরণ গ্রহণ করে, ভগবান তাঁকে দুস্তর সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করেন।

সীতা-বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ মহর্ষি মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করেছেন। অরণ্যপ্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ ও বিভিন্ন ঋতুতে সেই সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য বাল্মীকি অঙ্কিত করেছেন নিপুণ চিত্রকরের মতোই। বিপ্রলম্ভ, শৃঙ্গার বা বিরহের বর্ণনায় মহর্ষি যেন মহাকবি কালিদাসকেও অতিক্রম করেছেন। সীতা-বিরহে রামের বিলাপ শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত গোপী-গীতের সঙ্গে তুলিত হতে পারে।

রাম ও সুগ্রীবের মৈত্রী, রাম কর্তৃক বালীবধ, কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীবের অভিষেক ও সীতার অন্বেষণে বিভিন্ন সেনাপতির নেতৃত্বে বিভিন্ন দিকে বানরবাহিনী-প্রেরণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এই কাণ্ডে যে ভারতের পরিচয় রয়েছে, তা' হচ্ছে বাল্মীকির ধ্যানের ভারত—অখণ্ড, অবিভাজ্য। রামচন্দ্রের জীবনের ব্রতই ছিল আশ্রিতের রক্ষণ, অত্যাচারীর শাসন, দুর্বৃত্তের দমন, ক্ষাত্রধর্মপালন। অধর্মাচারী বালীকে দণ্ডদান করে তিনি তাঁকে স্বর্গে প্রেরণ করেছেন এবং শরণাগত সুগ্রীবকে লীলাসহচর রূপে গ্রহণ করেছেন। সুগ্রীবের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত না হলেও ভগবান রামচন্দ্রের সান্নিধ্যে তাঁর জীবনে ধীরে ধীরে দিব্য রূপান্তর ঘটেছিল। অকারণ সৈন্যক্ষয় নিবারণের জন্যেই শ্রীরামচন্দ্র বালীকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করেন নি। মৃত্যুকালে বালী রামের প্রতি কটূক্তি করেছিলেন সত্য, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের উপদেশে তাঁর চৈতন্য-সম্পাদন হয়েছিল।

সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রী ও বালী-নিধনের পর শ্রীরাম নল, নীল, জাম্ববান, হনুমান প্রভৃতি মহাবল-পরাক্রান্ত সেনাপতিগণকে লীলাসহচর রূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এদের ভেতর বীর ও ভক্ত হনুমানের চরিত্রটি বিশেষ ভাবেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তিনি ছিলেন বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, দেশকালজ্ঞ, নীতিনিপুণ, কার্যকুশল, বীর্যবান, শ্রদ্ধাবান, মেধাবান, শক্তিমান, পরমজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ যোগী।[১] তাই মহাবীরের পূজা ও তাঁর চরিত্রের অনুধ্যানের দ্বারা আমরাও জীবনে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ লাভ করতে পারি।

সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের অসাধারণ প্রভুভক্তি, প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, অনমনীয় বীর্য ও যোগৈশ্বর্যের পরিচয় আছে। তিনি সাগর লঙ্ঘন করেছেন, অশোকবনে

---

১. Hanuman, the heroic ideal of Hindusthan by Swami Maithilyananda.

বন্দিনী সীতাকে সান্ত্বনা দান করেছেন এবং লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেছেন। আবার হনূমান ছিলেন অসাধারণ আত্মজয়ী, ব্রহ্মচর্য-ব্রতে প্রতিষ্ঠিত,—তাই রাবণের নিদ্রিতা পত্নীগণকে নিরীক্ষণ করেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নি। হনূমানের রাজনীতি-জ্ঞানও ছিল অসাধারণ, তাঁর ভিতর উত্তম দূতের সকল লক্ষণই ছিল। রাবণের সভায় উপস্থিত হয়ে হনূমান মনে মনে চিন্তা করেছিলেন—

'অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাত্তদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥'

অহো, কী অপূর্ব রূপ, কী অসাধারণ ধৈর্য, কী অসামান্য শক্তি, কী অদ্ভুত দ্যুতি; অহো, এই রাক্ষসরাজ যে সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন। যদি এর অধর্ম বলবান না হোতো, তবে ইনি ইন্দ্রের সহিত সমস্ত সুরলোকের রক্ষাকর্তা হতেন।

রাবণ-সম্পর্কে হনূমান যা ভেবেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একমাত্র অধর্মাচরণের জন্যেই মহাবল-পরাক্রান্ত শক্তি-মদমত্ত রাবণ সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

হনূমানের মুখে সীতার বার্তা শ্রবণ করে এবং সীতার প্রদত্ত অভিজ্ঞান-মণি দর্শন করে শোকাকুল শ্রীরামচন্দ্র আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং লঙ্কাভিযানের আয়োজন করেছিলেন। আমরা বলি—হনূমানের কী প্রবল উদ্যম, কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কী অদ্ভুত প্রভুভক্তি, কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস! তাইতো ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে হনূমানও আমাদের বন্দনীয়।

যুদ্ধকাণ্ডে হনূমানের রণনৈপুণ্যেরও প্রচুর নিদর্শন আছে। এই কাণ্ডে লঙ্কার ঐশ্বর্য, নানারূপ সামরিক উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির যে বর্ণনা আছে, তা পড়ে মনে হয়, লঙ্কার সভ্যতার তুলনায় অযোধ্যা বা মিথিলার সভ্যতাও কত ম্লান। তথাপি এ সভ্যতা আসুরী সভ্যতা, এর মূলে রয়েছে অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষা, আর শ্রীরামচন্দ্র যে সভ্যতার প্রতিনিধি, সে সভ্যতা হচ্ছে ত্যাগমূলক দৈবী সভ্যতা। মুনিপুত্র রাবণ অবশ্য নাস্তিক বা বৈদিক সংস্কৃতির বিরোধী নন, কিন্তু তিনি কখনো ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হন নি, তিনি যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তারও লক্ষ্য হচ্ছে বাধাহীন ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ। বলদৃপ্ত রাবণ

কারো হিতোপদেশে কোন দিন কর্ণপাত করেন নি। অমাত্য শুক ও সারণ, মাতামহ মাল্যবান, রাণী মন্দোদরী, অকাল-প্রবুদ্ধ কুম্ভকর্ণ, সকলের হিতবাক্যই তিনি উপেক্ষা করেছেন। এই উপেক্ষার মূলে ছিল বলদৃপ্ত 'লোক-রাবণ' রাবণের অনমনীয় গর্ব। আবার মহাশক্তির অধিকারী হয়েও রাবণ ছিলেন ইন্দ্রিয়াসক্ত। তিনি তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তার জীবন ছিল অভিশপ্ত এবং তাঁর অমিতাচারের ফলেই, রাজলক্ষ্মী তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। বিভীষণ যখন তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে অপমানিত করেছিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যে কি ভাবে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিপ্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র শরণাগতবৎসল শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, বিভীষণ হচ্ছেন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঋষি-কবি এই ভাবেই তাঁর চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন, তাঁকে বিশ্বাসঘাতকরূপে অঙ্কিত করেন নি; বাস্তবিক, রাবণ-বধ ও সীতা-উদ্ধারকার্যে হনূমানের মতো বিভীষণও ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সহায় বা লীলা-সহচর।

আর্য রামায়ণের দু' একটি স্থানে রামচন্দ্র যে স্বয়ং নারায়ণ, তার উল্লেখ আছে। বহু রাক্ষস-নিধনের পর রাবণ যখন স্বয়ং রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করছিলেন, তখন রাণী মন্দোদরী তাঁকে রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাবণ তখন বলেছিলেন—'আমি জানি, সীতা হচ্ছেন মাতা ধরিত্রীর কন্যা আর রামচন্দ্র হচ্ছেন সাক্ষাৎ নারায়ণ, তথাপি আমি যুদ্ধে বিরত হবো না'।

ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়েছে,—রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি প্রতিকূল ভাবে অর্থাৎ শত্রুরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করে অল্প আয়াসেই বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন।

রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে আমরা দেখতে পাই, শরণাগত ও রণক্লান্ত শত্রুর প্রতি দয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাবণবধের পরে শ্রীরাম কেন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এ প্রশ্ন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। আমরা বলি ভগবানের লীলা আস্বাদনেরই বস্তু, বিচারের বস্তু নয়। তথাপি, স্বয়ং রামচন্দ্রের মুখেই আমরা শুনতে পাই, কি জন্যে তিনি সীতার প্রতি এমন নির্মম ব্যবহার করেছিলেন। সীতা

অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে স্বর্গত দশরথও তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন—'তোমার মঙ্গলের জন্যেই রামচন্দ্র তোমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন'।

যুদ্ধকাণ্ডের শেষ সর্গে রামরাজ্যের বৈশিষ্ট্য ও রামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মহর্ষি বাল্মীকি বলেছেন, প্রজাগণের কল্যাণকামী ও প্রজানুরঞ্জক লোকাভিরাম রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর—

'পূর্ণ হলো বসুন্ধরা, ধর্মে সদা হয়ে সুরক্ষিত,
হৃষ্টপুষ্ট জনগণে, হলো ধনধান্যেতে বর্ধিত।
দস্যুহীন হলো দেশ, রহিলনা শঙ্কা বিপদের,
রহিলনা সেথা আর অকালেতে মৃত্যু বালকের।
রহিল সন্তোষে সবে, হলো সবে ধর্মপরায়ণ,
ধর্মরত রামে হেরি, হিংসা সবে করিল বর্জন।
হলো বহু পুত্রবান্, রোগশোক-হীন সবে আর,
হলো শতজীবী, যবে শ্রীরাম নিলেন রাজ্যভার।
হলো বায়ু সুখস্পর্শ, ফলে-ফুলে পূর্ণ তরুগণ,
আরম্ভিল মেঘ তথা যথাকালে করিতে বর্ষণ।
হলো রত প্রজাকুল স্বধর্মেতে, স্বকর্মেতে আর,
হলো ধর্মনিষ্ঠ যবে শ্রীরাম নিলেন রাজ্যভার।
করিলেন রক্ষা রাজ্য হেনভাবে সর্বগুণবান্,
সর্বসুলক্ষণযুক্ত, সর্বধর্মপরায়ণ রাম।'

(বাল্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, অনুবাদ—আশালতা সেন)

কিন্তু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সত্যই লোকশিক্ষার জন্যে পৃথিবীতে মহত্তম দুঃখকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপুঞ্জের পালনে ও রক্ষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারপর প্রজারঞ্জনরূপ গুরুতর রাজকর্তব্যের অনুরোধেই তিনি জানকীকেও বিসর্জন দিয়েছিলেন। ভবভূতির উত্তরচরিত নাটকে এই করুণ কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য নির্বাসিতা সীতা মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে কন্যার ন্যায় স্নেহে পালিতা হয়েছেন ও যথাকালে পুত্রযুগল প্রসব করেছেন। তারপর হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি (স্বর্ণসীতা) সম্মুখে রেখে ভগবান রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন। এমন কত মর্মস্পর্শী কাহিনীই না রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে! শ্রীরামচন্দ্রের সভায় লব-কুশের রামায়ণ গান ও সীতার পাতাল-প্রবেশ, রামচন্দ্র কর্তৃক প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের বর্জন ও স্বয়ং সরযূ নদীর জলে প্রবেশপূর্বক দেহত্যাগ নরদেহধারী শ্রীভগবানের জীবনে

এ যেন নিয়তির লীলা, অথচ এই নিয়তিও তাঁর আজ্ঞাধীন। দুঃখবরণ ও দুঃখজয়ের ভেতরেই যে প্রকৃত মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব, রামায়ণী কথা যুগ যুগ ধরে এই শিক্ষাই তো আমাদের দিচ্ছে। 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ,' 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন তু রাবণাদি-বৎ' (রামচন্দ্র প্রভৃতির অনুসরণ করবে, রাবণ প্রভৃতির অনুসরণ করবে না),—রামায়ণ চিরদিন এই কথাই ঘোষণা করছে।

শ্রীরামচন্দ্রের লীলার স্মরণে ও কীর্তনে এবং তাঁর নাম জপে আমরা ধীরে ধীরে দিব্য জন্ম লাভ করি। নাম ও নামী অভিন্ন বলেই আমরা নামের গুণে মহাপাতক থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি। দস্যু রত্নাকর সধুসঙ্গের প্রভাবে ও নাম জপের গুণেই মহর্ষি বাল্মীকি-রূপে নবজন্ম লাভ করেছিলেন।[১] রত্নাকর দস্যুর কাহিনী মূল রামায়ণে নেই বটে কিন্তু সংস্কৃত অধ্যাত্ম রামায়ণে ও বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণে পাওয়া যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে স্বয়ং বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তাঁর এই নবজন্ম-লাভের কাহিনী বিবৃত করেছেন। তিনি বলছেন—মুনিগণের উপদেশে আমি 'মরা,' 'মরা' জপ করে বহির্বিষয় একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলাম।

'জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্।'

এমনি করে সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হোলো। মুনিগণ তখন আমায় বললেন, 'বেরিয়ে এসো'। এই কথা শুনে 'বল্মীকান্নির্গতশ্চাহং নীহারাদিব ভাস্করঃ'। ঋষিগণ বললেন—'যেহেতু বল্মীকের স্তূপ থেকে তুমি নিষ্ক্রান্ত হয়েছ, এইজন্যে তোমার নাম হ'ল বাল্মীকি। আর এটা হ'ল তোমার দ্বিতীয় জন্ম'।

যাঁরা নাম-সাধন করেন, তাঁরাই জানেন,—নামের কী অসীম শক্তি! পদ্মপুরাণেও এই নামের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে কত ভক্ত, কত সাধক জগন্মঙ্গল রামনামের বা তারক-ব্রহ্ম নামের গুণে ভবব্যাধির হস্ত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। ভগবানের নামকীর্তনে রয়েছে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন, তাঁর কথা-প্রসঙ্গ হচ্ছে 'হৃৎকর্ণ-রসায়ন,' আর তিনি হচ্ছেন মানবমনের নিত্য মহোৎসব। ভাগ্যবশে আমরা দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হয়েছি, তাই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে এই নিবেদন—তাঁর লীলাকীর্তনে, লীলারস-আস্বাদনে ও নামগানে আমাদের রুচি যেন উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দ মূর্তি, তিনি আদিহীন অথচ সকলের আদি, তিনি সকল-কারণস্বরূপ গোবিন্দ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

আদিপুরুষ সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর অশেষ বিভূতি (পৃথিবী, অপ্ প্রভৃতি) ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যিনি নিষ্কল অর্থাৎ পরিপূর্ণ, যিনি অন্তহীন ও অশেষভূত, আর ব্রহ্ম যে প্রভাবশালী গোবিন্দের অঙ্গকান্তি।

ভীষ্ম-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্ ।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥[১]

মহাতেজা সূর্য যেমন গভীর অন্ধকার থেকে দূরে থাকেন, তেমনি যাঁকে জেনে মুমুক্ষুগণ মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার ।

যস্তনোতি সত্যং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা ।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥

যিনি সত্য, মোক্ষের হেতু-ভূত তত্ত্বজ্ঞান এবং নিষ্কাম ধর্মের সাধক যোগাঙ্গের (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি) দ্বারা মুমুক্ষুগণের সংসার-তরণের উপায় বিধান করেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার ।

যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণে ক্ষিতিঃ ।
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥[১]

অগ্নি যাঁর মুখ, স্বর্গ যাঁর মস্তক, আকাশ যাঁর নাভি, ক্ষিতি যাঁর চরণ, সূর্য যাঁর চক্ষু, দিক সকল যাঁর কর্ণ, সেই লোকাত্মা অর্থাৎ জগন্মূর্তি পরমাত্মাকে নমস্কার ।

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ ।
যশ্চ সর্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥[১]

সকল জগৎ যাঁতে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর থেকে সকল জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, যিনি সর্বব্যাপী, সকল স্থানে যিনি বর্তমান রয়েছেন, যে দেব সর্বময়, সেই সর্বাত্মাকে নমস্কার ।

১. শান্তিপর্ব, মহাভারত ।

কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ধ্যানকালে এই শ্লোকটি আমাদের উচ্চারণ করতে হয়—

'বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥'

যিনি বসুদেবের পুত্র, যিনি কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়কে সংহার করেছেন, যিনি দেবকী দেবীকে পরম আনন্দ দান করেছেন, সেই জগদ্‌গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি।

এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত কয়েকটি তত্ত্ব আছে। সে তত্ত্বগুলি এই—

(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নররূপে লীলা করার জন্যেই বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বস্তুত তাঁর জন্ম ও কর্ম উভয়ই দিব্য (অলৌকিক বা অপ্রাকৃত)।

(২) তাঁর অবতরণের একটি প্রয়োজন হচ্ছে ভূভার-হরণ। এই উদ্দেশ্যেই তিনি অত্যাচারী বা দুষ্কৃতকারী অসুরগণকে সংহার করেছেন।

(৩) যাঁরা কোনো রস আশ্রয় করে তাঁর ভজনা করেন, তিনি তাঁদের পরম আনন্দ দান করেন।

(৪) ধর্মসংস্থাপনের জন্যেই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। যে ধর্ম শাশ্বত, যে ধর্ম সর্বদেশের সর্বমানবের কল্যাণকর, সেই ধর্মই তিনি স্থাপন করেছেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদ্‌গুরু' এই বিশেষণে বিশেষিত করা হ'ল কেন? পূর্ববর্তী একটি শ্লোকে তার কারণের ইঙ্গিত করা হয়েছে—

'প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥'

শরণাগতের যিনি কল্পতরু, অশ্ব-চালনার সময় যিনি এক হস্তে লাগাম ও অপর হস্তে চাবুক ধারণ করেন, যিনি জ্ঞানরূপ মুদ্রাযুক্ত এবং গীতারূপ অমৃতকে যিনি দোহন করেছেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের ইঙ্গিত করা হয়েছে,—এই ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অধিকারী বলেই তিনি প্রপন্ন জনের বাঞ্ছাকল্পতরু।

শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে, শ্রীভগবান পার্থসারথি। পার্থসারথিরূপে তিনি নিজের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও সমর-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তদুপরি—

তিনি জ্ঞানবলেও শ্রেষ্ঠ। শুধু অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে প্রেরণা দেবার জন্যেই নয়, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যেই তিনি গীতারূপ 'অমৃত দোহন করেছেন।

অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পরিপূর্ণ মানবতার অদর্শ, এ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বকপোল-কল্পিত নয়। আর্য-মহাভারতে বলা হয়েছে, রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন—'কোন্ পূজনীয় ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম অর্ঘ্য দান করব?' ভীষ্মদেব উত্তর করলেন—'সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণই অর্চনীয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য'।

'এষ হ্যেষাং সমস্তানাং তেজোবলপরাক্রমৈঃ।
মধ্যে তপন্নিবাভাতি জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ॥'

সকল নৃপতির মধ্যে ইনি তেজের দ্বারা, বলের দ্বারা ও পরাক্রমের দ্বারা সাতিশয় দীপ্যমান, যেমন সকল জ্যোতিঃপদার্থ-মধ্যে ভাস্কর সর্বাপেক্ষা দীপ্তিশালী।

তখন সহদেব বৃষ্ণিকুলজাত শ্রীকৃষ্ণকে পরমভক্তিভরে অর্ঘ্য প্রদান করলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই গৌরব কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর ক্রোধের সঞ্চার হ'ল। তিনি তিরস্কার করলেন যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মকে। যুধিষ্ঠির তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিশুপালের ক্রোধ শান্ত হ'ল না। তখন ভীষ্ম বললেন, সমগ্র নরলোকে এমন কেউ নেই, যিনি গুণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম করতে পারেন।

'দানং দাক্ষ্যং শ্রুতং শৌর্যং হ্রীঃ কীর্ত্তির্বুদ্ধিরুত্তমা।
সন্ততিশ্রীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ নিয়তাচ্যুতে॥'

দান, দক্ষতা, বিদ্যা, শৌর্য, হ্রী অর্থাৎ লজ্জা, কীর্তি, উত্তমা বুদ্ধি, বিনয়, শ্রী, ধৃতি, পুষ্টি ও তুষ্টি এই সকল গুণ গোবিন্দে নিত্য বিরাজিত।

তারপর ভীষ্মদেব রাজগণকে সম্বোধন করে বললেন—আপনারা আমাদের এই অর্ঘ্যদান অনুমোদন করুন।

শরতল্পশায়ী ভীষ্ম কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবও আদ্যোপান্ত ভক্তিরসে অভিষিক্ত ও ভাব-গাম্ভীর্যে তুলনারহিত। শ্রীকৃষ্ণ যে ভীষ্মদেবের নিকট পরিপূর্ণ ভগবত্তা ও পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ, এই সুদীর্ঘ স্তবটি পাঠ করলে তা' সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একদিকে পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ, অপর দিকে মহাভারত বা অখণ্ড ভারতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যে 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মরাজ্য-পাশে বেঁধে দিয়েছিলেন', এটা ঊনবিংশ শতকের কবির কল্পনা নয়, মূল মহাভারত থেকে এ কথা প্রতিপন্ন করা চলে।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের দুটি বিখ্যাত শ্লোকে শ্রীভগবান বলেছেন কখন কি উদ্দেশ্যে তিনি অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। শ্লোক দু'টির ভেতর তিনটি কথা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,—ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান ও ধর্মসংস্থাপন।

'যখন যখন ঘটে ধর্মের গ্লানি হে ভারত।
অধর্মের অভ্যুত্থান,
আপনারে আমি করিহে সৃজন,
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের,
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।'

(নবীন সেনের অনুবাদ)

মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'অবতারবাদ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'কোন ব্যক্তিবিশেষের, সম্প্রদায়বিশেষের, জাতিবিশেষের ব্যবহারে যদি মানবসমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, তাহা হইলেই ধর্মের গ্লানি ঘটিয়া থাকে। যাহা ধারণ করিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম; শক্তির সামঞ্জস্য-অবস্থাতেই ধারণার উদ্ভব হয়। এই সামঞ্জস্যের অভাবের নামই ধর্মের গ্লানি। রোগসকল দেহধর্মের

গ্লানি।[১] পাপ সমাজ-ধর্মের গ্লানি। সাম্যাবস্থার নাশ যাহা হইতে হয়, তাহাই ধর্মের গ্লানি। ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে সাধুর হৃদয় কাতর হইয়া উঠে, সেই কাতর আহ্বানে ভগবান স্থির থাকিতে পারেন না, দুষ্কৃতের নাশ ও সাধুর পরিত্রাণের জন্য তাঁহাকে অবতার-গ্রহণ করিতেই হয়।'

দ্বাপরযুগের শেষে স্বৈরাচারী কংসের অত্যাচারে জননী বসুন্ধরা যখন ক্রন্দন-রতা, যখন বহু স্বার্থান্ধ, বলদৃপ্ত ও মদগর্বিত নরপতি ধর্মের আদর্শ থেকে প্রমত্ত, যখন দুর্বৃত্তের পীড়নে সাধুগণ ভীত সন্ত্রস্ত, যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থানে ভক্তহৃদয় বেদনাবিহ্বল, সেই সময়ে ভূভার-হরণের জন্যে 'অজন্মা সমজনি', যিনি জন্মরহিত, তিনি আবির্ভূত হলেন। দৈববাণী-শ্রবণে ভীত কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন, নিরপরাধ ছয়টি শিশুর শোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করেছেন। বসুদেব-পত্নী রোহিণীর গর্ভে বলরামের আবির্ভাব হ'-লেও কংসের অত্যাচারের নিবৃত্তি হয় নি, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের শুভ অষ্টমী তিথিতে কংসের কারাগারে এক দিব্য শিশুর আবির্ভাবে হ'ল। তিমিরাবৃতা দুর্যোগময়ী রজনীতে, মথুরাবাসীরা যখন যোগনিদ্রার প্রভাবে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন সেই সময়ে, নন্দ-যশোদার সদ্যোজাতা কন্যা কংসের কারাগারে ও বসুদেব-দেবকীর সদ্যোজাত পুত্র নন্দগৃহে আনীত হ'ল। কংস যখন প্রাণভয়ে আবার শিশুহত্যায় প্রবৃত্ত, তখন শুনতে পেলেন নিয়তির মতো অমোঘ সেই দৈববাণী—

'তোমারে বধিবে যে
কোথাও বাড়িছে সে।'

শ্রীমদ্ভাগবতে কোনো স্থানের উল্লেখ নেই। কিন্তু আমাদের দেশের জনশ্রুতি অনুসারে দৈববাণী হচ্ছে এইরূপ—

'তোমারে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।'

---

১. আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে—ধাতুবৈষম্যই রোগ, ধাতুসাম্যই (বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতাই) অরোগিতা। এইজন্যেই

Health is something more than freedom from diseases.

ভীত কংস মথুরার সকল শিশু-নিধনে প্রবৃত্ত হলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে নিধন করার জন্যে তিনি যে সকল কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সকলই ব্যর্থ হ'ল। পরে কংসকে নিধন করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জন্ম ও কর্মের কথা প্রাপ্ত হওয়া যায় মহাভারতে, বিষ্ণু-পুরাণে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে ও হরিবংশে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ব্রত ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ভীমসেনের দ্বারা দ্বৈরথ যুদ্ধে জরাসন্ধকে বধ করান, শিশুপালকে বহুবার ক্ষমা করেও পরিশেষে ভূভার-হরণের জন্যে স্বয়ং তাঁকে নিধন করেন।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলে অদ্বিতীয়, বুদ্ধিনৈপুণ্যে অতুলনীয়, সমর-কৌশলে অপরাজেয়, তিনি নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞানী, ধর্মসংস্থাপক। যে সূত্রে সমগ্র মহাভারতের ঘটনাপুঞ্জ গ্রথিত, সে সূত্র হচ্ছে—'যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ, যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। মহাভারতের উপদেশ হচ্ছে—

'অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্‌ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥'

অধর্মের দ্বারা মানুষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অধর্মের দ্বারাই জাগতিক মঙ্গল দর্শন করে, অধর্মের দ্বারাই শত্রু বিনাশ করে, পরিণামে অধর্মের দ্বারাই সে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছেন।

নরদেহধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নিয়তির অধীন। কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের সভায় গমন করেছিলেন কিন্তু দুর্যোধনের 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্রমেদিনী' এই মনোভাবের জন্যে তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে। সম্ভবত এই ব্যর্থতার মূলে ছিল দ্রৌপদীর দীর্ঘশ্বাস। আবার কুরুক্ষেত্রের মহাধ্বংস-লীলার পরে পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে যে অভিশাপ দেন, তার ফলে যদুবংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, গান্ধারীর অভিশাপ একটা উপলক্ষ্যমাত্র,—সুরাপান, ব্যভিচার প্রভৃতি অধর্মের ফলে যদুবংশের ধ্বংস একদিন অনিবার্য। শ্রীকৃষ্ণ

শুধু নির্লিপ্ত-ভাবে নিজের বংশের ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেন নি, নিজেও ধ্বংসকার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ—এও হয়তো দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিরই লীলা। আর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সংবরণের পর অর্জুন এমন শক্তিহীন হয়ে পড়লেন যে দস্যুদের হস্ত থেকে যদুবংশীয় নারীদের রক্ষা করতে পারলেন না।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, আমরা মহাভারতের এই মহামানবের ভেতর এমন একটি আদর্শ দেখতে পাই যাঁর সামনে অপর সকল আদর্শ ম্লান হয়ে যায়। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সকল বৃত্তি সম্যক স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ও সমঞ্জসীভূত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

'তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্যে ও অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া সর্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে সর্বলোকের হিতে রত। যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণের প্রচার করিয়া, তারপর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, বেদে ধর্ম নহে—ধর্ম লোকহিতে—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ শুধু পূর্ণ মানব নহেন, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ একীভূত করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতার আদর্শ হ'-লেও তাঁর জীবনের ব্রত ছিল মহাভারতের প্রতিষ্ঠা। আমরা বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত পূর্ণতার আদর্শ (ideal of perfection); আর নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ প্রধানত জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতিষ্ঠাতা (nation-builder)। রৈবতক কাব্যে গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গর্গের ভবিষ্যদ্বাণী :

'তব গোচারণ-ক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা,
সমগ্র মানব জাতি গোপাল তোমার ;
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা
দেখি পদচিহ্ন; শুনি বেণুর ঝঙ্কার।'

তারপর তন্দ্রাগত শ্রীকৃষ্ণের দিব্যানুভূতি :

'শুনিলাম—এক জাতি মানব সকল ;
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব-হৃদয় ;
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম-সাধন,
যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।'

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আমরা সকলেই সমস্বরে উচ্চারণ করতে পারি—'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্'।

একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্মসংস্কারক নয়, ধর্মসংস্থাপক। যিনি ধর্মসংস্কারক, তিনি প্রচলিত ধর্মের উপর, আচার-ব্যবহার রীতিনীতির উপর আঘাত হানেন, তাঁকে এক হাতে ভাঙতে হয়, আর এক হাতে গড়তে হয়। যিনি ধর্মসংস্থাপক, তিনি প্রচলিত ধর্মের মাহাত্ম্য স্বীকার করেও উহাকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেন। খৃষ্ট ছিলেন একজন ধর্মসংস্থাপক, তাই তিনি বলেছেন—

'I have not come to destroy, but to fulfil the prophets.'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন তখন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাচুর্য ছিল। শ্রীকৃষ্ণ বেদের নিন্দা করলেন না, তিনি বললেন—বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে মানুষের ভোগবহুল স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কিন্তু মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না। সেইসঙ্গে মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স্ লাভের উপায়ও তিনি প্রদর্শন করলেন। বৈদিক যাগযজ্ঞের চেয়ে উচ্চতর ও মহত্তর আদর্শ তিনি স্থাপন করলেন। সেটা হচ্ছে যজ্ঞার্থে (ভগবানের প্রীতির জন্যে) অথবা লোকসংগ্রহের (লোককল্যাণের) জন্যে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত কামনা বিসর্জন দিয়ে কর্ম করা। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে অনেকের ধারণা ছিল, নারী জাতি, বৈশ্য ও শূদ্র পরাগতি লাভ করতে পারে না। শ্রীভগবান প্রচলিত মতের বিরোধিতা না করেও বললেন, —'আমি সর্ব দেহে বিরাজমান, আমার নিকট

প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই। যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না, যিনি আমাকে আশ্রয় করবেন তিনিই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করবেন।'

মহাভারতের কর্ণপর্বে দেখি, যুধিষ্ঠির অর্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করলে অর্জুন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হন। তখন অর্জুনকে এই মহাপাতক থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে সব উপদেশ দেন, তা এ যুগের মানুষেরও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন— বেদে ধর্ম আছে এ কথা কোন কোন পণ্ডিত বলে থাকেন। আমি এই মতের নিন্দা করি না, কিন্তু বেদে যা নির্দিষ্ট হয়েছে তাই যে সকল সময়ে সকল অবস্থায় পালনীয়, এ কথা সত্য নয়। যা প্রজাসমূহকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম; যা অহিংসা-সংযুক্ত, তাই ধর্ম। সত্যের স্বরূপও অনেক ক্ষেত্রে দুর্জ্ঞেয়। যার দ্বারা লোককল্যাণ সাধিত হয়, তাই সত্য। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যও মিথ্যা হয় আবার মিথ্যাও সত্য হয়।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন, লোকশ্রেয়ই ধর্ম। অতএব 'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' যা করা যায়, তা' ধর্ম। তাই জন স্টুয়ার্ট মিলের অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ-বিধান (greatest good of the greatesr number) উৎকৃষ্ট চরিত্রনীতি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' শ্রীকৃষ্ণ-কথিত ধর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'আদর্শ পুরুষ কখনো মিথ্যা কথা বলেন না, কিন্তু যেখানে মিথ্যাই সত্য সেখানে কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক মিথ্যা বলেন।'

সকলেই জানেন, এই মন্তব্যকে উপলক্ষ্য করে প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের অসিযুদ্ধ নয়, তথাকথিত মসীযুদ্ধ ঘটেছিল।

পার্থসারথির উপাসনা ও ধ্যানের ভেতর দিয়ে একটা বলিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন জাতি গড়ে উঠতে পারে।

ভারতবর্ষের বৈষ্ণবরা কিন্তু প্রধানত গীতার শ্রীকৃষ্ণকে নয়, গীতের শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করে থাকেন। দক্ষিণ ভারতের আলোয়াড় সম্প্রদায় মধুরভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করেছেন। লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে' লিখেছেন—

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্।

মধুর রসের উপাসক বল্লভাচার্য 'মধুরাষ্টক' রচনা করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও বলা হয়েছে—রম্য তিনি, রুচির তিনি, ভক্তের নিকট নব-নবায়মান তিনি, মনের নিত্য মহোৎসব তিনি, শোকার্ণবশোষণ (যিনি শোকসমুদ্রকে শুষ্ক করেন) তিনি। অন্যত্র বলা হয়েছে—তাঁর কথা হৃদয় ও কর্ণের পক্ষে রসায়নস্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত প্রভৃতির অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য ও লীলামাধুর্যের বর্ণনা করেছেন।

'কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লৈয়া গোপীগণ॥

* * *

নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ-চারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
অশ্রু বহে, পুলক কম্পধার॥' ইত্যাদি

প্রতিবর্ষে শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে আমরা ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম করি ধর্মসংস্থাপনকারী পার্থসারথিকে, প্রণাম করি বৃন্দাবনবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে। যাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্যও অনন্ত, যিনি দুর্বৃত্তের দমনকারী হয়েও অখিলরসামৃতসিন্ধু ও সকল কল্যাণগুণের আকর, তাঁর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করে বিল্বমঙ্গলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

'হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে একদিন ভগবান পদ্মনাভের মুখপদ্ম থেকে যে অমৃতধারা উৎসারিত হয়েছিল, সেই ধারায় অবগাহন করে বিশ্বের কত নরনারী ধন্য হয়েছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের বাণী বিশ্বের ত্রিতাপ-দগ্ধ মানুষকে চিরকাল পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছে। ভগবদ্গীতা স্বয়ং একখানি উপনিষৎ এবং সকল উপনিষদের সারভূতা।

'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥'

উপনিষদ্‌সমূহ হচ্ছেন গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই গাভীসমূহের দোহনকর্তা, বৎস হচ্ছেন অর্জুন, সুধীগণ হচ্ছেন সেই দুগ্ধের পানকর্তা আর মহাদুগ্ধ হচ্ছে অমৃতময়ী গীতা।

প্রাচীন ও আধুনিক আচার্যগণ প্রত্যেকেই এক একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যেক আচার্যই আমাদের নমস্য। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টিতে গীতার প্রথম ও শেষ কথা হচ্ছে শরণাগতি। গীতার প্রারম্ভেই বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের উক্তি—

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'

'আমি আপনার শিষ্য (শাসনযোগ্য), আমি আপনার শরণাগত, আমায় উপদেশ দান করুন।' আবার অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের শেষ উপদেশ-বাক্য—

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

'সকল ধর্ম (বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম প্রভৃতি, লৌকিক আচার প্রভৃতি) পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণাগত হও।'

তারপর, অর্জুনের প্রতি তথা বিশ্বমানবের প্রতি আশার বাণী—

'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

'আমি তোমায় সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না।'

অর্জুনের বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্যে মোহগ্রস্ত হ'লেও তিনি শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাই তিনি ধর্মযুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে মহাবীর কর্ণ শুধু নিজের পৌরুষের উপর নির্ভর করেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে এসেছিল এমন শোচনীয় ব্যর্থতা ও পরাজয়।

কিন্তু শ্রীভগবানে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ তো কথার কথা নয়। যতকাল দেহাত্মবুদ্ধি থাকে, বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহ যতকাল মানুষকে চঞ্চল করে, ততকাল সে প্রপন্ন হতে পারে না। তাই ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ধীরে ধীরে এই ভাবনা করতে হয় যে আমি তাঁর দাস। এই ভাবে ধীরে ধীরে অহংবুদ্ধি কমে যায়।

ভগবদ্‌গীতার শেষ কথা হচ্ছে, 'মামেকং শরণং ব্রজ'। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এটাই শেষ কথা নয়। শ্রীভগবান শুধু অনন্ত ঐশ্বর্যশালী নন, তিনি অখিল-রসামৃত-সিন্ধু। আমরা সবাই জানি, ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ প্রকার—শান্ত রতি, দাস্য রতি, সখ্য রতি, বাৎসল্য রতি ও মধুর রতি। যিনি বৃন্দাবনের কোনো একটি ভাবকে আশ্রয় করে রাগমার্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফলের কোনো ফলই বাঞ্ছা করেন না।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ দুর্বৃত্তের দমনকারী, দ্রৌপদীর লজ্জাহারী, শিষ্ট জনের রক্ষাকারী, ধর্মের সংস্থাপয়িতা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সিংহনাদকারী, আর শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁর অলৌকিক ঐশ্বর্যলীলা বর্ণিত হ'লেও তিনি তথায় প্রধানত মধুর বেণু-নিনাদকারী, গোপীজন-মনোহারী, 'স্ময়মানমুখাম্বুজ,' 'সাক্ষাৎমন্মথ মন্মথ'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণের নাম ও লীলাকীর্তন এবং ভক্তিযোগে তাঁর আরাধনাই কলিযুগের যুগধর্ম।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে—সেই পরম পুরুষ এই জগতের সকল স্থানে বাস করেন, আর সকল বস্তুই তাঁর মধ্যে অবস্থান করেন, তাই জ্ঞানীরা তাঁকে বলেন বাসুদেব। এই বাসুদেবে ভক্তিই আমাদের জীবনে পরম পুরুষার্থ।

এই ভক্তিযোগের লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

> 'লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
> অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥'

কোনো হেতুকে অবলম্বন না করে অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি বিসর্জন দিয়ে অব্যবধানে শ্রীভগবানের যে ভজনা—তাই হচ্ছে নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র বলা হয়েছে—

'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ॥'

শ্রীভগবানের নামগ্রহণাদির দ্বারা তাঁতে যে ভক্তিযোগ, তাই হচ্ছে মানবগণের একমাত্র পরম ধর্ম।

শ্রীভগবান ভক্তাধীন, ভক্তির বশীভূত, সুতরাং তিনিও পরতন্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলছেন—

'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥'

(হে দ্বিজ,) পরাধীন ব্যক্তির মতো আমিও ভক্তাধীন। সাধু ভক্তজনের দ্বারা আমার হৃদয় একান্তভাবেই অধিকৃত, আমি ভক্তজনের প্রিয়, ভক্তজনও আমার প্রিয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির মাহাত্ম্য এই ভাবে কীর্তিত হয়েছে—

'কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।

বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥'

ভক্তি ভিন্ন শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, চিত্ত দ্রবীভূত হয় না, আনন্দাশ্রু বিগলিত হয় না ও মন শুদ্ধ হয় না।

আর এই ভক্তি লাভের উপায় শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং

তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।

তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং

যদুত্তমশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে॥'

সেই সংকীর্তন হচ্ছে মনোরম ও রুচির, উহা নিতুই নূতন, উহা নিত্য-কালের জন্যে মানবমনের মহোৎসব, উহা শোকার্ণব-শোষণ—যে সংকীর্তনের দ্বারা উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়।

এই কীর্তনের ফলে যখন ভক্তহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় তখন—

'ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ

হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥'

ভক্তগণ সেই অচ্যুতের চিন্তনে কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দে বিহ্বল হন, কখনও অলৌকিক কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও বা তাঁর লীলার অনুশীলন করেন, কখনও বা তাঁকে হৃদয়ে লাভ করে আনন্দজনিত মৌন অবলম্বন করেন।

শ্রীভগবানের নরবপু-ধারণের একটি প্রয়োজনীয় কথা ভগবদ্গীতায় বলা হয় নি, বলা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বলা হয়েছে—

'অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥'

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যে মানুষের দেহ আশ্রয় করে তিনি এমন লীলা করেছিলেন, যা শ্রবণ করে লোক তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হয়ে থাকে।

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন ধর্মসংস্থাপনার্থায় ভক্তানামনুগ্রহায় চ। ধর্মসংস্থাপকরূপে তিনি শাশ্বত ধর্ম (অর্থাৎ যে ধর্মের আচরণে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষ কল্যাণ লাভ করে), যুগধর্ম, আপদ্ধর্ম, রাজধর্ম ও মোক্ষধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন আর ভক্তগণের অনুগ্রাহকরূপে তিনি প্রেমধর্মকে মহিমান্বিত করেছেন, যোগমায়ার দ্বারা আপন স্বরূপ আচ্ছাদন করে 'নিজসম সখাসঙ্গে' বৃন্দাবনে বিহার করেছেন, চঞ্চল ক্রীড়াশীল বালগোপাল-রূপে জননী যশোমতীর অন্তরে সন্তান-বাৎসল্য জাগিয়েছেন, গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই গোপিকাগণের ভেতর আবার—

'গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দ-মোহিনী।
গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকান্তাশিরোমণি ॥'
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥'

সকল অবতারই হচ্ছেন পুরুষোত্তমের অংশ ও বিভূতি, আর কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। অসুরগণের দ্বারা উপদ্রুত জগৎকে ইনিই যুগে যুগে পরিত্রাণ করেন ও জগতের সুখবিধান করেন।

সেই পুরুষোত্তমই আমাদের শরণ্য, আমাদের চিন্তনীয় ও বন্দনীয়, তিনিই পার্থসারথি-রূপে আমাদের অন্তরে আবির্ভূত হয়ে পাঞ্চজন্যের ধ্বনিতে আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করে আমাদিগকে স্বধর্মে প্রবর্তিত করুন, আবার বৃন্দাবনবিহারী পরম রসিকশেখর-রূপে তিনি আমাদের অন্তরে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রেমভক্তির সঞ্চার করুন। তাঁর নামগান ও লীলাকীর্তন, ইষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর প্রসঙ্গের আলোচনা, তাঁর ভজন ও স্বরূপ-চিন্তন প্রভৃতির ভেতর দিয়ে যেদিন আমরা ভাগবতী তনু লাভ করব, শুধু সেইদিনই আমাদের মানবজীবন সার্থক হবে। তাই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আমাদের নিবেদন—তিনি আমাদের অন্তরাকাশে আবির্ভূত হয়ে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করুন ও মঙ্গলরূপ জ্যোৎস্না বিতরণ করুন, তার কৃপা বর্ষার বারিধারার মতো আমাদের মস্তকে ঝরে পড়ুক, আর আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে অনুক্ষণ ধ্বনিত হতে থাক—'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্'। শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে ভীত ও বিস্ময়-বিমূঢ় অর্জুনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥'

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

শ্রীবিদগ্ধমাধব

শচীনন্দনরূপী শ্রীহরি সর্বদাই আপনাদের হৃদয়রূপ কন্দরে স্ফুরিত হোন। কোনো কালে যা প্রদত্ত হয় নি এমন যে নিজের প্রেমসম্পদ তাই-বিতরণ করার জন্যে তিনি করুণাবশে অবতীর্ণ হয়েছেন আর সেই প্রেমে রয়েছে উজ্জ্বল বা মধুর রসের পরিপূর্ণতা। তাঁর দেহকান্তিও স্বর্ণবর্ণ দ্যুতিসমূহের দ্বারা উজ্জ্বল বা দীপ্যমান।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীস্বরূপ গোস্বামি করচায়াং

শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণপ্রেমেরই বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ স্বরূপত তিনিই কৃষ্ণপ্রেম, তিনি কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি। তাঁরা একাত্ম হয়েও লীলারস আস্বাদনের জন্যে অনাদিকাল থেকে ভিন্ন দেহ আশ্রয় করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁরা দু'জন একত্ব প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। যিনি স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণ হয়েও শ্রীমতী রাধার ভাব (কৃষ্ণপ্রেম) ও অঙ্গকান্তি (গৌর-কান্তি) নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।

নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্

'হে গোলোকবিহারী হরি, নেমে এসো মর্ত্যের ধূলিমাঝে, ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীর মরুতুল্য শুষ্ক হৃদয় অভিষিক্ত করে দাও ভক্তির স্নিগ্ধ ধারায়। আজ সনাতন ধর্মের এ কী গ্লানি, বিদ্বজ্জন-অধ্যুষিত নবদ্বীপ থেকেও ভক্তিধর্ম আজ বিলুপ্ত। ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় অধ্যাপকগণ ও তাঁদের শিষ্যগণ ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও জাতি-কুলের গর্ব আজ সীমাহীন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁদের ধর্ম আজ প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানে পর্যবসিত। এমনকি, যাঁরা ভাগবতাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাঁদের অন্তরও ভক্তিশূন্য। আজ এই নবদ্বীপে, এই শান্তিপুরে অধর্মের অভ্যুত্থান দেখতে পেয়েও কী তোমার আসন টলবে না? হে ক্ষীরোদসাগরশায়ী, এখনো কী তুমি নিদ্রিত থাকবে? এই ধূলিমলিন ধরায় তোমাকে যে অবতীর্ণ হতেই হবে, আমার অন্তরের এই আকুল প্রার্থনাকে উপেক্ষা করতে পারো, এমন শক্তি তোমার নেই।'

প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য গোবিন্দের চরণে তুলসী অর্পণ করতেন আর তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে হুঙ্কার ও তর্জন করতেন। মহাপ্রভুর চরিতকারেরা বলেন, শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কার ও তর্জনেই ভগবান নেমে এসেছিলেন মর্ত্যের ধূলায়।

ভক্ত কবি তুলসীদাস একটি মাত্র শ্লোকে কবীশ্বর বাল্মীকি ও কপীশ্বর হনূমানের বন্দনা করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'সীতারাম-গুণগ্রাম পুণ্যারণ্য-বিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ॥'

আমি কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ও কপিশ্রেষ্ঠ হনূমানকে বন্দনা করি। এঁরা দুজনেই সীতারামের গুণগ্রামরূপ পুণ্যারণ্যে বিহার করেছেন এবং এঁরা দুজনেই বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী।

লক্ষ্য করার বিষয়, ভক্ত কবি এখানে দুটি সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, যা ক্রান্তদর্শী মহর্ষি বাল্মীকি ও দাস্যরতির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মহাবীর, উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দুটি শ্লোক পাই যাতে একই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও প্রভু নিত্যানন্দের বন্দনা করা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের শ্লোকটি হচ্ছে—

'আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥'

আমি জগতের প্রিয়কারী, করুণার অবতার, যুগধর্মের পালক, বিশ্বের ভরণ-কর্তা, দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরসুন্দর ও প্রভু নিত্যানন্দের বন্দনা করি। এঁদের দুজনেরই বাহু আজানুলম্বিত, বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, নয়ন কমলের ন্যায় আয়ত। এঁরা দুজনেই সংকীর্তনের একমাত্র মাতা ও পিতা অর্থাৎ প্রবর্তক।

এই শ্লোকটিতে আমরা লক্ষ্য করি, শ্রীমন্নিত্যানন্দের শিষ্য ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস গোস্বামীর মতে শ্রীগৌরসুন্দর ও প্রভু নিত্যানন্দ প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন কলিহত জীবের নিকট যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তনের জন্যে, তাঁরাই জীবকে শিখিয়েছিলেন, সংকীর্তন-যজ্ঞে যাঁরা ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের শ্লোকটি হচ্ছে—

'বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ
চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥'

আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। এঁরা গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে একই কালে সমুদিত সূর্য ও চন্দ্রের মতো,—এই আবির্ভাব জীবের পক্ষে কল্যাণপ্রদ ও পরম বিস্ময়কর। এঁরা অজ্ঞানতিমিরান্ধ জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে নাশ করেছেন।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্য ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামী বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবেরই মুখ্য প্রয়োজন নিজরসাস্বাদন, কলিযুগের যুগধর্ম নামের প্রচার সে-আবির্ভাবেরই আনুষঙ্গিক ফল। শ্রীমতী রাধার ভাবকান্তি নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূরণের জন্যে।

এই ত্রিবিধ বাঞ্ছা হচ্ছে—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন, তা জানতে হবে, তিনি আমার যে অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যের চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করতে হবে, আর আমাকে আস্বাদন করে শ্রীমতীর যে সুখ হয়, সেই সুখ কেমন, তাও উপলব্ধি করতে হবে। তাই তো বৈষ্ণব মহাজন বলেন—

'যদি গৌর না হইত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
জগতে জানাত কে ॥'

চৌদ্দ শ সাত শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে নদীয়ারূপ উদয়গিরিতে যখন পূর্ণচন্দ্ররূপী গৌরহরি উদিত হলেন, তখন সকলঙ্ক চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হলেন এবং চন্দ্রগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক হরিধ্বনিতে মুখরিত হোলো। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতকারগণের চোখে এই চন্দ্রগ্রহণ ব্যাপারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—

'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে ভাসে ত্রিভুবন ॥
জগৎ ভরিয়া লোক বোলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি।
প্রসন্ন হইল সর্ব জগতের মন।

* *

প্রসন্ন হইল দশ দিক প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল' ॥

(আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবার পূর্বে তাঁরই লীলার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল —শ্রীমাধব পুরী, শ্রীঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল মহাপ্রভুরই দিব্যলীলার প্রয়োজনে, আর তাঁর লীলা-সহচর বা পরিকরগণের সংখ্যাও ছিল অগণিত ; যথা গদাধর,

শ্রীনিবাস, মুকুন্দ, স্বরূপ দামোদর (পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য), রায় রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি। আর ছিলেন বৃন্দাবনের ষড়্‌ গোস্বামী—

'শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥'

সর্বোপরি উল্লেখ করতে হয় সেকালের দুজন প্রসিদ্ধ মায়াবাদী বৈদান্তিক পণ্ডিতের কথা যাঁরা মহাপ্রভুর নিকট শাস্ত্রবিচারে পরাজিত হয়ে ভক্তিধর্মে নতুন দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তাছাড়া, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীও মহাপ্রভুর কাব্যবিচার-নৈপুণ্যে বিস্মিত হয়ে এবং স্বপ্নে তাঁর স্বরূপ অবগত হয়ে তাঁরই চরণে শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের এই বাংলাদেশ মহাপ্রভু ও তাঁর অগণিত পরিকরের পাদরজঃ-স্পর্শে ধন্য হয়েছে, তাই আমরা প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাও স্মরণ করে ধন্য হই। ধন্য এই কলিযুগ, যে যুগে যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রচারিত হয়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের একান্ন শ্লোকে বলা হয়েছে—

'কলের্দোষনিধে রাজন্‌
অস্তি হ্যেকো মহান্‌ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য
মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥'

হে রাজন্‌! কলিযুগ নানা দোষের আকর হলেও এই যুগের একটি মহৎ গুণ আছে। এই যুগে শুধু কৃষ্ণ-সংকীর্তনের প্রভাবেই মানুষ ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং পরম পুরুষকে লাভ করে।

ভাগবতের উক্তির প্রতিধ্বনি করেই বাংলার বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

'প্রণমহ কলিযুগ সর্বযুগসার।
হরিনাম-সংকীর্তন যাহাতে প্রচার॥'

বাঙ্গালী সংস্কৃতির ত্রিবেণী-সঙ্গম

বাংলায় ষোড়শ শতাব্দী শুধু বাংলা সাহিত্যেরই স্বর্ণযুগ নয়, এটা হচ্ছে বাংলার মনীষা ও অধ্যাত্ম চেতনার নব-জাগরণের যুগ, বাঙ্গালী সংস্কৃতির নব অভ্যুত্থানের

যুগ। এই শতকে এক মহাভাবের বন্যায় শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র উড়িষ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী ও সুবিস্তৃত দাক্ষিণাত্য অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল এবং এই প্লাবনের ধারা সপ্তদশ শতাব্দীতেও শুষ্ক হয়ে যায় নি। এই ষোড়শ শতকেই বাংলায় চরিত-সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তন ঘটেছিল, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যও অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল, ভক্তিমূলক সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছিল এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলোকে নতুন রসশাস্ত্র ও নতুন দর্শন ব্যাখ্যাত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের দানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শতকেই জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি মহাজনগণের রচিত অনুপম প্রেমগাথায় বাংলার পদাবলী-সাহিত্যকুঞ্জ মুখরিত হয়ে উঠেছিল। উৎকলবাসী পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্য রচনা করে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব' স্থাপন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় গৌড়ীয় দর্শনের অনুমোদিত 'গীতাভাষ্য' রচনা করেছিলেন।

আবার ষোড়শ শতকের বাঙ্গালী মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল নব্যন্যায়-বিষয়ক নানা নিবন্ধ-রচনায়। এদিকে ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক সাধক ও সিদ্ধ পুরুষগণ নানা তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করে তন্ত্রশাস্ত্র-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাই এ কথা বলা চলে যে, ষোড়শ শতকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছিল এবং ভাববিপ্লবী বাঙ্গালী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সঙ্গে বাঙ্গালী সংস্কৃতির আর একটি ধারারও উল্লেখ করতে হয়, সেটা হচ্ছে যুগোপযোগী নব্যস্মৃতি রচনার ধারা। এই ষোড়শ শতকেই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ, সম্পূর্ণরূপে প্রাক্তন স্মৃবিগণের অনুসরণ না করে এবং সমাজ-কল্যাণের আদর্শকে সম্মুখে রেখে অভিনব স্মৃতিনিবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূর্তির জন্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্যে জীবভাব অঙ্গীকার করেছিলেন। নাম-মাহাত্ম্য

ও প্রেমধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর অবতরণের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণ ভগবান হয়েও

......'ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
অপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।'

তাই তাঁর দ্বিবিধ লীলা।

'বহিরঙ্গ লৈয়া করে নাম-সংকীর্তন।
অন্তরঙ্গ লৈয়া করে রস-আস্বাদন॥'

মহাপ্রভু রায় রামানন্দের ভেতরে শক্তি সঞ্চার করে তাঁর মুখ দিয়ে রস-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধা-তত্ত্ব, প্রেম-তত্ত্ব, সাধ্যসাধন-তত্ত্ব প্রভৃতি বিবৃত করেছেন, সনাতনকে শিক্ষাদানের ছলে তিনি কলির বহির্মুখ ও মায়ামুগ্ধ জীবকে শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করেছেন, শ্রীরূপ গোস্বামীর মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চারিত করে বৃন্দাবনের বিলুপ্তা রসকেলিবার্তা অর্থাৎ রসলীলার কথা পুনঃপ্রচার করেছেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে ফল্গু বৈরাগ্যের পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে যুক্ত-বৈরাগ্যের পথে প্রবর্তিত করেছেন। আমরা সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও তো শ্রীরূপের কবিত্ব-শক্তি, সনাতনের দৈন্য ও আর্তি এবং রঘুনাথের বৈরাগ্যের তুলনা দেখতে পাই না। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত 'শিক্ষাষ্টকের' আটটি মাত্র শ্লোকে নাম-মাহাত্ম্য ও অপ্রাকৃত প্রেমের গৌরব কীর্তিত হয়েছে।

করুণাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্য জীবনের আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর চরিত্রে কুসুমের পেলবতার সঙ্গে বজ্রের কঠোরতার এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর এই কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি আচরণে, ছোট হরিদাসের বর্জনে, কাজীর আদেশ-লঙ্ঘনে। যাঁরা মহাপ্রভুকে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রবর্তক বলেছেন, তাঁরা তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিকই লক্ষ্য করেছেন। যাঁর রূপ-বর্ণনা করতে গিয়ে গোবিন্দ-দাস বলেছেন—

'কাঞ্চন-শোণ কুসুম কনকাচল
জিতল, গৌরতনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগ-মনোমোহন ভাঙ্গনি রে॥'

তাঁর ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু, 'নব-মেঘ জিনি' গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি, সিংহসদৃশ

গ্রীবা, সিংহবীর্য ও সিংহসদৃশ হুঙ্কারের কথা উল্লেখ করতেও কবিরাজ গোস্বামী ভোলেন নি। আবার গোবিন্দ দাস ধ্যানমগ্ন বা আত্মসমাহিত চিত্তে দর্শন করেছেন, মহাপ্রভু যেন জঙ্গম হেমকল্পতরু, বিনা প্রার্থনায় তিনি পতিত পাষণ্ডী সবাইকে প্রেমফল বিতরণ করেছেন।

সংকীর্তন-যজ্ঞ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বহুবিধ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সংকীর্তন-যজ্ঞের উল্লেখ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে কিন্তু বলা হয়েছে, 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' তাই মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দ রায়কে বলেছেন,—

'নাম-সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম দুটি শ্লোকে নাম-মহিমা কীর্তন করেছেন ও তৃতীয় শ্লোকে কিভাবে নাম-কীর্তন করতে হবে, তার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে এই শ্লোকটিতে বৈষ্ণবের লক্ষণও বলা হয়েছে। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি এই—

'চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥'

শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্তন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে অর্থাৎ সর্বপ্রকার মলিনতা থেকে মনকে মুক্ত করে, সংসাররূপ দাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে, আর শুভ্র কৌমুদী-ধারার মতো কল্যাণ বিতরণ করে, আনন্দসাগরকে স্ফীত করে এবং সকলের আত্মাকে তৃপ্তিধারায় স্নিগ্ধ করে দেয়। এই 'সংকীর্তন' বিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, আর এর প্রতিপদে রয়েছে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন,— তাই এই সংকীর্তনই জয়লাভ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—জ্ঞানীর নিকট যিনি পরব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্তম বস্তু, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা বা অন্তর্যামী, ভক্তের নিকট তিনিই ভগবান। ভক্তগণ এই অখিলরসামৃতসিন্ধু ভগবানেরই নামকীর্তন করেন। তাঁরা যাগযজ্ঞাদি কর্মের পথ, বিচারমূলক জ্ঞানের পথ ও কৃচ্ছ্রসাধন-মূলক যোগের পথ পরিত্যাগ করে একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করেন, তাই ভগবৎ-কৃপালাভে তাঁরা ধন্য হন।

শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকটি হচ্ছে—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥'

শ্রীভগবানের বহু নাম আছে আর প্রত্যেকটি নামেই তিনি নিজের সকল শক্তি অর্পণ করেছেন। তাঁর নাম স্মরণের কোনো কালও নির্দিষ্ট নেই। হে ভগবন! তোমার এমনি কৃপা, কিন্তু আমার এমন দুর্দৈব যে তোমার নামে আমার অনুরাগের সঞ্চার হোলো না।

শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকটি আমরা সকলেই জানি কিন্তু এর গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করি না। শ্লোকটি হচ্ছে—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।'

স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায়কে মহাপ্রভু বলছেন—

'উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেই কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥

এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥'
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য-লীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ)

সনাতন-শিক্ষা

ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান যেমন অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নরনারীকে পরম কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তেমনি সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদানের ছলে আমাদের শ্রেয়ের পথের, পরমা শান্তির পথের সন্ধান দিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীসনাতন জিজ্ঞাসা করেছেন,

'কে আমি কেনে আমারে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়॥
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥'

প্রভুপাদ সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করলেন—আমি কে? কেনই বা ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত হচ্ছি? আমার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় বা মঙ্গলের পথই বা কি? সাধ্য বস্তুই বা কি? সাধ্যবস্তু লাভ করার উপায়ই বা কি?

সনাতন গোস্বামীর প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন—জীব স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিভুচৈতন্য আর জীব হচ্ছে অণুচৈতন্য, সুতরাং চৈতন্য-হিসাবে জীব ও ভগবানে রয়েছে অভেদ-সম্বন্ধ, আবার যেহেতু জীব অণু ও ভগবান বিভু, সেইজন্যে তাঁদের মধ্যে আছে ভেদ-সম্পর্ক। ভগবান যেন সূর্য আর জীব হচ্ছে তার বহিশ্চর রশ্মি, ভগবান যেন অগ্নি আর জীব হচ্ছে তার স্ফুলিঙ্গ। সূর্যের সঙ্গে কিরণের ও অগ্নির সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের যে সম্পর্ক, তা যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্পর্ক।

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
সূর্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।'
(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০ পরিচ্ছেদ)

এটাই হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। যা অচিন্ত্য, তা যুক্তি-তর্কের দ্বারা বোঝা যায় না, শ্রীভগবানের কৃপালাভে যাঁরা ধন্য হন, তাঁরাই

এই সব তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই জন্যেই যা শুধু অনুভবের বস্তু, তা নিয়ে তর্ক করতে নেই। আচার্য শঙ্করও বলেছেন—

'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।'

উৎকলের পণ্ডিত-প্রবর শ্রীল—বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তের যে ভাষ্য রচনা করেছেন, তাতে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন,—ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন নি, স্থাপন করেছেন অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ।

জীব স্বরূপত কৃষ্ণের নিত্যদাস, তাই জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই কৃষ্ণসেবার মহান অধিকার আছে। ধন্য তিনি, যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সেবক বলে জানেন, আর দাস্যভাবে যিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন। কৃষ্ণসেবার এই মহান অধিকার রয়েছে শুধু মানুষের। মহাপ্রভু যে পঞ্চ সাধনার কথা বলেছেন, কৃষ্ণসেবা তার অন্যতম।

'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ মাঝে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু শুধু যে মানুষকে মহান মর্যাদা দান করেছেন, তাই নয়, সনাতন গোস্বামীকে তিনি বলেছেন, 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নর-লীলা।' শ্রীভগবানের যেমন আছে অনন্ত ঐশ্বর্য, তেমনি আছে অনন্ত মাধুর্য। কিন্তু ভগবান অখিলরসামৃতসিন্ধু, আর তাঁর ঐশ্বর্যলীলার চেয়ে মাধুর্যলীলাই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশে বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত-ধারা॥'
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ)

বিষয়ী মানুষ কেন ত্রিবিধ দুঃখের অনলে নিরন্তর দগ্ধ হয় তাঁর উত্তরে মহাপ্রভু বলছেন—

'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥'

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক যে অর্থে 'মায়া' কথাটির ব্যবহার করেছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু সে অর্থে কথাটির প্রয়োগ করেন নি। তাঁর উপদেশ হচ্ছে—জগৎ মিথ্যা নয়, ভগবদ্বিমুখতা ও দেহাত্মবোধই মায়া। এই মায়ার প্রভাবেই জীবের কৃষ্ণবিস্মরণ ঘটে আর এই বিস্মৃতির ফলেই জীব ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জরিত হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—যাঁরা আমার শরণাগত হন, শুধু তাঁরাই এই দুরতিক্রমণীয়া মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন।

মহাপ্রভু বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তির বশীভূত। আর ভক্তিই হচ্ছে কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। শ্রীকৃষ্ণের এমনি অপার করুণা যে, যাঁরা আর্ত বা অর্থার্থী হয়ে তাঁর ভজনা করেন, তাঁদেরও তিনি স্বীয় চরণে আশ্রয় দান করেন। ধ্রুব রাজ্যকামনা করেই তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পদ্ম-পলাশলোচন হরির দর্শন পেয়ে তাঁর সকল কামনার নিবৃত্তি ঘটেছিল।

কি উদ্দেশ্যে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, সে কথাও তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। শ্রীভগবান সে কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্লেন—বৎস, বর গ্রহণ কর। ধ্রুব উত্তর করলেন—

'স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবানস্মি মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নম্
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥'

আমি রাজ্য কামনা করে তপস্যা আরম্ভ করেছিলাম, প্রাপ্ত হলাম তোমাকে। জানি তুমি শ্রেষ্ঠ মুনিগণের নিকটও গোপনীয়, তাঁরাও তোমার দেখা পান না। সুতরাং আমার কী ভাগ্য! আমি অন্বেষণ করছিলাম কাঁচ, পেলাম দিব্য রত্ন; স্বামিন্, কৃতার্থ হয়েছি; আর কোনো বর চাই না।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন—সংসারে মানুষের চারটি পুরুষার্থ আছে। এই চারটি হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চারটিকে বলা হয় চতুর্বর্গ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছে—প্রেমই হচ্ছে পুরুষার্থ-শিরোমণি। আমাদের রতি গাঢ় হয়েই ধীরে ধীরে প্রেমে পরিণতি লাভ করে। এই প্রেমের নিকট মোক্ষ-বাঞ্ছাও অতি তুচ্ছ। যাঁরা ভগবানের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরা কখনও মুক্তির, বিশেষত সাযুজ্য মুক্তির বাঞ্ছা করেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

'মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান,
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর নিকট ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাবময়ী রাধিকার গুণরাশি, যথার্থ বৈষ্ণবের লক্ষণ, বৈধী, রাগানুগা ও রাগাত্মিকা ভক্তির পার্থক্য, ভক্তিভেদে পঞ্চপ্রকার রতিভেদ প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

'অবৈষ্ণব-সঙ্গ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে॥
হানি-লাভ সম, শোকাদির বশ না হইবে।
অন্য দেব, অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ)

দেখা যাচ্ছে, বৈষ্ণবের আদর্শ সহজ আদর্শ নয়। যথার্থ বৈষ্ণব হবেন উদারচেতা, স্থিতপ্রজ্ঞ, স্থিতধী। তিনি বহুশাস্ত্র-কলাভ্যাস বর্জন করবেন, কারণ, নানাশাস্ত্রের অনুশীলনের ফলে মানুষের মন অনেক সময় সংশয়ে আকুল হয়ে পড়ে। আর বাস্তবিক, মেধা, প্রবচন বা নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দ্বারা

তো ভগবানকে লাভ করা যায় না। শ্রীভগবান যাঁকে কৃপা করেন, একমাত্র তাঁর নিকটই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি বিশেষ শিক্ষা হচ্ছে কপট বা ফল্গু বৈরাগ্যের আশ্রয় করা কল্যাণের পথ নয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—'অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত-বৃত্তিসমূহের নিরোধ করতে হয় অর্থাৎ চিত্তকে একাগ্র করতে হয়।' কিন্তু এরূপ বৈরাগ্যও তো শুষ্ক বৈরাগ্য। যতদিন বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকে, ততদিন অন্তরে যথার্থ বৈরাগ্যের সঞ্চার হতে পারে না। ভগবানের প্রতি অনুরাগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা সেই পরিমাণে হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং যুক্ত বৈরাগ্যের একটা নতুন তাৎপর্য রয়েছে। শ্রীভগবানের প্রতি যে বিশিষ্ট রাগ বা অনুরাগ, তারই নাম হচ্ছে বিরাগ, আর সেই বিরাগ বা বিশিষ্ট অনুরাগের ভাবই হচ্ছে বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল রঘুনাথদাস গোস্বামী। কিন্তু একদিন এই রঘুনাথকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছিলেন—

'মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥'

তপ্ত ইক্ষু-চর্বণ

রায় রামানন্দ বলেছেন, যেমন একমাত্র পৃথিবীতে সকল ভূতের গুণ বর্তমান, তেমনি একমাত্র মধুর রসেই সকল রসের বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়েছে। সুফী-সাধকদের ভেতর এবং খৃষ্টীয় মিষ্টিক বা অলোকপন্থী সাধক-সাধিকাদের ভেতরেও প্রেমসাধনার ধারা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যে রাগানুগা ভক্তির বা রাগমার্গে ভগবদ্-ভজনের কথা বলেছেন, তার ধারা ও রসাস্বাদনের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, শ্রীভগবানের দেহ ও তাঁর কর-চরণাদি সকলই অপ্রাকৃত আর মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা তাঁর সেবায়, তাঁর মাধুর্য আস্বাদনে।—

বংশীগানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না হেরে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

*

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্রসম, জানিহ, সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা-সম॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম গণি॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ)

অতএব, যাকে প্রেম বলা হয়, তা হচ্ছে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা'। এই অপ্রাকৃত প্রেম সম্পর্কে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

'অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।'

ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট কোনো পার্থিব সম্পদই কামনা করেন না, তিনি কামনা করেন অহৈতুকী ভক্তি। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

'ন ধনং ন জনং সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥'

হে জগদীশ্বর, আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী নারী বা কাব্য-প্রতিভা চাই না (অথবা সুন্দরী অর্থাৎ মনোহারিণী কবিতা চাই না।) আমার জন্মে জন্মে তোমার প্রতি যেন অহৈতুকী ভক্তি থাকে ।

আবার কখনো জীবভাব আশ্রয় করে তিনি বলছেন—হে নন্দনন্দন! আমি বিষম সংসার-সাগরে পতিত হয়েছি, আমি তোমার দাস, কৃপা করে আমায় তোমার পাদপদ্মের ধূলিসদৃশ মনে কর।

কখন পরম উৎকণ্ঠাভরে বলছেন—তোমার নাম সংকীর্তনের ফলে কবে আমার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হবে, বাক্য বাষ্পরুদ্ধ হবে ও সমগ্র দেহ পুলকে পরিব্যাপ্ত হবে।

এই প্রেমের পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় বিরহে বা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে। এই যে বিরহের আস্বাদন, একে কবিরাজ গোস্বামী 'তপ্ত ইক্ষু-চর্বণে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন, তিনি বলেছেন, এই বিরহে 'বিষামৃতে একত্র মিলন'। প্রেমিক বলেন সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভের ভেতর বিপ্রলম্ভই আমাদের অধিকতর কাম্য, কেননা সম্ভোগে যাঁকে আমরা কাছে পাই, বিরহে তাঁকে নিখিল ভুবনে ব্যাপ্ত করে দিই। নীলাচলে অবস্থিতিকালে দ্বাদশ বৎসরকাল মহাপ্রভুর দিব্য তনুতে এই 'বিরহ-চেষ্টা স্ফুরে নিরন্তর'। এই হচ্ছে শ্রীগৌরসুন্দরের দিব্যোন্মাদ-লীলা।

মহাপ্রভুর ভেতরে যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের স্ফূর্তি হয়েছে, তখন তিনি 'উদ্বেগ বিষাদ দৈন্যে করেন প্রলপন'। শিক্ষাষ্টকের সপ্তম শ্লোকে এই বিরহের আর্তিই প্রকট হয়েছে।

'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥'

শ্রীগোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষকাল এক যুগ বলে মনে হচ্ছে, নয়নে বর্ষার ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, নিখিল ভুবন শূন্য বলে বোধ হচ্ছে।

এই প্রেম-সাধনার শেষ কথা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন। শিক্ষাষ্টকের শেষ শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনামন্মর্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥'

আমি তাঁর চরণসেবায় নিরতা, তিনি আমায় আলিঙ্গন করে বক্ষে নিষ্পেষিতই করুন অথবা আমায় দর্শন না দিয়ে মর্মহতাই করুন, আর যেখানে তাঁর অভিরুচি, সেখানেই তিনি বিহার করুন, তথাপি একমাত্র তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেউ নন।

পরিশিষ্ট

কয়েকটি বিশিষ্ট স্তোত্র

শ্রীব্যাসদেবকথিতং শ্রীরামাষ্টকম্

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্॥ ১
জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ২
নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৩
সদা প্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৪
প্রপঞ্চহীননির্মলং বিকল্পহং নিরাময়ং।
চিদেকরূপসন্ততং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৫
ভবাব্ধিপোতরূপকম্ হ্যশেষদেহকল্পিতং।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৬
মহর্ষিবাক্যবোধকৈর্বিরাজমানবাক্পদৈঃ।
সরোজজন্মসেবিতং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৭
শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহম্।
বিরাজমানদৈশিকং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥ ৮
রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণুতে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্তিং
সংপ্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষম্॥ ৯

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি, যিনি বিশেষরূপে সৌন্দর্যশালী, সমস্ত পাপকে যিনি খণ্ডন করেন, আর নিজ ভক্তগণের চিত্ত যিনি রঞ্জিত করেন।[১]

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি, যাঁর মস্তক জটাকলাপে শোভিত, যিনি সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন এবং যিনি ভক্তগণের ভয় ভঞ্জন করেন।[২]

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি, যিনি ভক্তগণকে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেন, যিনি কৃপার আকরস্বরূপ, যিনি ভব-বন্ধন মোচন করেন, যিনি সর্বস্থানে একরূপ, যিনি কল্যাণপ্রদ ও নিরঞ্জন অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক।[৩]

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি, যিনি মায়ার সাহায্যে নিজেকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করেন, কিন্তু বস্তুত জ্ঞানীর নিকট যিনি নাম ও রূপ-বর্জিত, তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে যাঁর দেহও নেই, আধি-ব্যাধিও নেই।[৪]

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি, যিনি প্রপঞ্চের (মায়াময় জগতের) অধীন নন, যিনি মলিনতাশূন্য, সংশয় ও ভেদ-বুদ্ধিকে যিনি বিনাশ করেন, যিনি বিকার-রহিত ও যিনি সর্বদা চিন্ময়রূপে (চৈতন্যময়রূপে) বিরাজমান।[৫]

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি যিনি ভবসাগর পার হবার পক্ষে নৌকাস্বরূপ, নানা দেহে অবিস্থিত বলে যিনি পরিকল্পিত হয়েছেন, যিনি গুণসমূহের আকর ও কৃপাময়।[৬]

আমি এমন স্তবের দ্বারা পদ্মসম্ভব ব্রহ্মার পূজিত সেই অদ্বয় অর্থাৎ দ্বৈতহীন শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি যা মহর্ষি বাল্মীকির বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্যকে প্রকাশ করে এবং যাতে স্বয়ং বাগ্দেবতা বিরাজ করেন।[৭]

আমি সেই অদ্বয় অর্থাৎ দ্বৈতরহিত শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি, যিনি যুগপৎ কল্যাণপ্রদ ও আনন্দপ্রদ, যিনি ভববন্ধন থেকে মানুষকে মুক্তিদান করেন, যিনি মানুষের মোহকে দূরীভূত করেন এবং সকলের পক্ষেই যিনি সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ।[৮]

এই 'রামাষ্টক' (রামচন্দ্র সম্পর্কে আটটি শ্লোক নিবদ্ধ এই স্তোত্র) ব্যাসদেব কর্তৃক কথিত, ইহা মানুষের পক্ষে শুভকর ও অতীব পুণ্যজনক,—যে মানুষ ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি ইহলোকে বিদ্যা, সম্পদ, বিপুল আনন্দ ও অশেষ কীর্তি লাভ করেন এবং দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করেন।[৯]

দীপিকা

উদ্ধৃত রামাষ্টকের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যাসদেব যে শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করেছেন, তিনি নরবপুধারী ও বিশেষভাবে সৌন্দর্য-শালী, তাঁর মস্তক জটাজুটে আবৃত, তিনি কৃপার আকর ও কল্যাণপ্রদ অথচ স্বরূপত তিনি হচ্ছেন নাম ও রূপের অতীত, নিরঞ্জন, মায়াতীত, ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হবার পক্ষে তিনি নৌকাস্বরূপ। ব্যাসদেব একই সঙ্গে ভক্ত ও তত্ত্ব-জ্ঞানী,—কিন্তু যে উপাস্য ও উপাসকের ভেদের ওপর ভক্তিধর্ম প্রতিষ্ঠিত, সেই ভেদকে তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি জানেন, জীব অণুচৈতন্য আর পরব্রহ্ম বিভুচৈতন্য, তাই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য তিনি স্বীকার করেন নি।

'রামাষ্টকের' সমাপ্তি শ্লোকে প্রবৃত্তিমার্গের মানুষের জন্য এই স্তব পাঠ বা শ্রবণের ফল কীর্তিত হয়েছে। যাঁরা সাধনার সর্বোচ্চ গ্রামে আরোহণ করেছেন, নিষ্কাম কর্মের আদর্শ শুধু তাঁদেরই জন্যে। সাধারণ মানুষ ফল কামনা করেই যেমন সংসারের যাবতীয় কর্ম করেন, তেমনি ধর্ম-কর্মও করে থাকেন। আর সকাম ভাবেও যাঁরা পুণ্য কর্ম করেন, ইহলোকে পরলোকে তাঁরা মঙ্গল লাভ করেন, এ কথা তো অযৌক্তিক নয়। তাই রামায়ণের উপসংহারে মহাকবি কৃত্তিবাস বলেছেন—

'অনুপম রামকথা কে পাইবে সীমা।
অসীম অনন্ত রাম অনন্ত মহিমা ॥
পুণ্য বৃদ্ধি হয় যাঁর কবিলে স্মরণ।
পাপী মুক্ত হয় যে শুনিলে রামায়ণ ॥
চারি বেদ পাঠ কৈলে যত ফল হয়।
রামনামে তার কোটি গুণ ফলোদয় ॥
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব পাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥'

শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত)

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো । ।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ১

অংসালম্বিতবামকুন্তলভরং মন্দোন্নতভ্রূলতং
কিঞ্চিৎকুঞ্চিতকোমলাধরপুটং সাচিপ্রসারেক্ষণম্ ।
আলোলাঙ্গুলিপল্লবৈর্মুরলিকামাপূরয়ন্তং মুদা
মূলে কল্পতরোস্ত্রিভঙ্গললিতং জানে জগন্মোহনম্ ॥ ২

হে গোপালক হে কৃপাজলনিধে হে সিন্ধুকন্যাপতে
হে কংসান্তক হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ হে মাধব !
হে রামানুজ হে জগৎত্রয়গুরো হে পুণ্ডরীকাক্ষ মাং
হে গোপীজননাথ পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥ ৩

কস্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্ ।
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপালচূড়ামণিঃ ॥ ৪

লোকানুন্মদয়ন্ শ্রুতিং মুখরয়ন্ ক্ষৌণীরুহান্ হর্ষয়ন্
শৈলান্ বিদ্রবয়ন্ মৃগান্ বিবশয়ন্ গোবৃন্দমানন্দয়ন্ ।
গোপান্ সম্ভ্রময়ন্ মুনীন্ মুকুলয়ন্ সপ্তস্বরান্ জৃম্ভয়ন্ ।
ওঙ্কারার্থমুদীরয়ন্ বিজয়তে বংশীনিনাদঃ শিশোঃ ॥ ৫

সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্ ।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য-যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥ ৬

হে দেব, হে বল্লভ, হে নিখিল ভুবনের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চঞ্চল, হে একমাত্র করুণাসাগর, হে নাথ, হে রমণ, হে লোচনরঞ্জন, হায়! কখন আমি তোমার দর্শন লাভ করব ?[১]

যাঁর অংসে (স্কন্ধে) কুঞ্চিত কুন্তল-কলাপ (কেশসমূহ) বিলম্বিত, ভ্রূলতা যাঁর মন্দোন্নত (ঈষৎ উন্নত), কোমল অধরপুট মৃদুস্মিতের দ্বারা কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, যিনি বক্র কটাক্ষ করেন, ঈষৎ চঞ্চল অঙ্গুলি-পল্লবের দ্বারা যিনি বংশী ধারণ করেন ও আনন্দ সহকারে যিনি বেণুবাদন করেন, কল্পবৃক্ষের মূলে যিনি সুন্দর ত্রিভঙ্গ-রূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁকেই আমি ভুবনমোহন বলে জানি।[২]

হে গোপালক, হে করুণাসিন্ধু, হে সিন্ধুকন্যাপতি (লক্ষ্মীপতি), হে কংসান্তক, হে গজরাজের প্রতি অসীম করুণাশালি, হে মাধব, হে বলরামের অনুজ, হে ত্রিভুবনগুরো, হে কমললোচন, হে গোপীজননাথ, আমাকে পালন কর, আমি একমাত্র তোমাকেই জানি, অপর কাউকে জানিনা।[৩]

যিনি ললাটে কস্তুরীর তিলক ধারণ করেছেন, যাঁর বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-মনি বিরাজিত, যাঁর নাসাগ্রে নব মৌক্তিক শোভমান, যাঁর করে কঙ্কণের শোভা ও করতলে বংশী, যাঁর সকল অঙ্গে হরিচন্দন, কণ্ঠে যিনি মুক্তার মালা ধারণ করেছেন, এবং যিনি গোপনারীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন, সেই গোপালচূড়ামণির জয় হোক।[৪]

ত্রিলোককে উন্মত্ত করে, শ্রুতি অর্থাৎ বেদকে প্রকটিত করে, বৃক্ষসমূহকে হর্ষান্বিত করে, প্রস্তরসমূহকে বিগলিত করে, পশুসমূহকে বিবশ করে, গোসমূহকে আনন্দিত করে, গোপগণকে ত্বরান্বিত করে, মুনিগণকে পুলকিত করে, সপ্তস্বর মূর্চ্ছিত করে, ওঙ্কার বা প্রণবের অর্থ প্রকটিত করে গোপশিশুর বেণুনিনাদ জয়যুক্ত হয়।[৫]

হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার কল্যাণ হোক, হে স্নান, তোমাকে নমস্কার করি, হে দেবগণ, পিতৃগণ, তোমরা তর্পণ-কার্যে অক্ষম আমার অপরাধের মার্জনা কর, আমি যেখানে সেখানে অবস্থান করে যাদবকুলের অলঙ্কারস্বরূপ কংসারিকেই পুনঃ পুনঃ স্মরণ করব এবং এতেই আমার সকল পাপের ক্ষয় হবে,—আমি মনে করি, ইহাই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমার সন্ধ্যাবন্দন, স্নান, তর্পণ প্রভৃতির প্রয়োজন কি ?[৬]

দীপিকা

উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব লীলাশুক বা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' থেকে গৃহীত। লীলাশুক শুধু রাগমার্গেই শ্রীভগবানের ভজনা করেন নি, শ্রীকৃষ্ণের যে রূপমাধুরী তিনি দুই নেত্র ভরে পান করেছেন, অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তার বর্ণনা করেছেন। স্তবটির প্রথম শ্লোকে বিপ্রলম্ভ বা বিরহের আর্তি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। শেষ শ্লোকটিতে তিনি বলেছেন, কৃষ্ণপ্রেমে যিনি আত্মহারা, তাঁর পক্ষে স্নান, সন্ধ্যাবন্দন, পিতৃলোক বা দেবলোকের উদ্দেশে তর্পণ প্রভৃতির প্রয়োজন নাই।

দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু দু'খানি পুঁথি সংগ্রহ করেন—ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত। নীলাচলে অবস্থান-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের (সুকণ্ঠ গায়ক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্যের) সঙ্গে দিবানিশি

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।'

আস্বাদন করতেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদে; রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটকে, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ও জয়দেব গোস্বামীর শ্রীগীতগোবিন্দে কোথাও রসাভাস বা সিদ্ধান্তবিরোধ নেই, তাই এই সব গ্রন্থ শ্রবণ করে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিশিদিন আনন্দসাগরে ডুবে থাকতেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন—

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥'

এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের বপুখানি মধুর, মধুর চেয়েও মধুর। মধুর, অতি সুমধুর তাঁর বদনখানি, দেহে তার মধুর সৌরভ, তাঁর মৃদুহাস্যও মধুগন্ধি, তাঁর সকলই মধুর, অতি সুমধুর।

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে ভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন—

'কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিকে বহে যার পূর॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ)

ব্রহ্মা-কৃত শ্রীগোবিন্দস্তব (ব্রহ্মসংহিতা)

বেণুং ক্বণন্তম্ অরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১

আলোলচন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশী
-রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়-সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপং
আদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৬

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা ।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৭

ধর্ম্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ ॥
যদ্দত্তমাত্রবিভব-প্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি বেণুবাদনকারী, যাঁর নয়ন পদ্মদলের মতো আয়ত, ময়ূরপুচ্ছ-শোভিত চূড়া যিনি ধারণ করেছেন, যাঁর অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় সুন্দর, কোটি কন্দর্পের চাইতেও যিনি কমনীয় ও বিশেষ কিশোরবেশে যিনি শোভা পাচ্ছেন।[১]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যাঁর চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছে অবস্থিত চন্দ্র আন্দোলিত হচ্ছে, যিনি বনমালী, মোহন-বংশীধারী ও রত্নাঙ্গদ, যিনি প্রণয়ক্রীড়া-রূপ কলার বিলাসযুক্ত, যিনি শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ও কমনীয় এবং নিয়ত-প্রকাশমান।[২]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যাঁর প্রতিটি অঙ্গ সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-যুক্ত (শ্রীভগবানের দেহ অপ্রাকৃত ও চিন্ময়, তাই তিনি প্রতিটি অঙ্গের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য নিষ্পন্ন করতে পারেন), চিরকাল যিনি দর্শন করেন, চিরকাল যিনি পালন করেন, চিরকাল যিনি সকলই নিরীক্ষণ করছেন। তাঁর বিগ্রহ আনন্দ-চিন্ময়, সৎ ও উজ্জ্বল।[৩]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত ও অচ্যুত, যিনি অনাদি ও অনন্ত, যিনি আদ্য পুরাণপুরুষ এবং যাঁর অঙ্গে অঙ্গে নব-যৌবনের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বিরাজিত। তিনি বেদে দুর্লভ অর্থাৎ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না, কিন্তু আত্মভক্তির দ্বারা তিনি সুলভ।[৪]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, প্রেমরূপ অঞ্জনের (কজ্জলের) দ্বারা পূর্ণ ভক্তিরূপ নেত্রে সাধুগণ যাঁকে স্ব-হৃদয়ে দর্শন করেন। তিনিই অচিন্ত্য-গুণস্বরূপ শ্যামসুন্দর।[৫]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি প্রভাবশালী এবং ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গকান্তি, যাঁর বিভূতি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, যাঁর ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি বিভূতি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, যিনি অংশহীন, অন্ত্যহীন ও অশেষভূত।[৬]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যাঁর মায়া কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করছে এবং বেদের কামনামূলক কর্মকাণ্ডে (ত্রৈগুণ্যবিষয় বেদে) তাই কীর্তিত হচ্ছে। সেই আদিপুরুষ মায়া-সম্পর্কশূন্য, তিনি সত্ত্বাশ্রয় ও শুদ্ধ সত্ত্বের মূর্তি।[৭]

আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, ধর্ম ও পাপনিচয়, শ্রুতিসমূহ, তপস্যা এবং ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত যাবতীয় প্রাণী যাঁর প্রদত্ত বিভবের দ্বারা আপন আপন প্রভাব প্রকাশ করে, অর্থাৎ যিনি সকলের সকল কর্মের প্রবর্তক।৮

দীপিকা

আমরা পূর্বেই বলেছি, শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ পরিক্রমা-কালে দু'খানা পুঁথি সংগ্রহ করেন—ব্রহ্মসংহিতা ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'। তারপর ভারতের নানা অঞ্চলে যে এই গ্রন্থ দু'খানি বহুল প্রচারিত হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তার উল্লেখ আছে।

'প্রত্যেক বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ দেশে আদি-কেশবের মন্দিরে গমন করেন, তখন ভক্তগণ সম্মিলিত কণ্ঠে ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করছিলেন। এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত গ্রথিত হয়েছে, এটা উপলব্ধি করে শ্রীমন্মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল হলেন এবং এই গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করালেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত হয়েছে—

'সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানে পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥'

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ওপর একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন।

ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত এই—শ্রীকৃষ্ণই পরম ঈশ্বর, ব্রহ্ম হচ্ছেন তাঁরই অঙ্গের কান্তি, আর মায়া হচ্ছেন তাঁরই কিঙ্করী। তাঁর দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। জীব অণুচৈতন্য, আর ভগবান বিভুচৈতন্য। ভক্তিযোগে ভগবদ্-ভজনেই জীবনের পরম সার্থকতা। চিন্ময় ও অপ্রাকৃত বৃন্দাবন তাঁরই নিত্যধাম। তিনি অনাদি ও সকলের আদি, সকল কারণের তিনিই একমাত্র কারণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ বিজয়েতাম্‌।

শ্রীগৌরসুন্দর-নিত্যানন্দ-বন্দনা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ১

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥ ২

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥ ৩

গৌড়দেশ-রূপ উদয়াচলে একই কালে সমুদিত শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। এঁদের এই আবির্ভাব একই কালে সমুদিত সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় আশ্চর্য, অন্ধকার-নাশক ও কল্যাণপ্রদ।[১]

জগতের প্রিয়কারী, করুণার অবতার সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীমন্নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি; এঁদের উভয়েরই ভুজদ্বয় জানু পর্যন্ত লম্বিত, বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোরম, লোচনদ্বয় কমলদলের ন্যায় আয়ত। এঁরা সংকীর্তনের একমাত্র প্রবর্তক, বিশ্বের ধারণকর্তা ও যুগধর্মের পালনকর্তা।[২]

আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নামক দুই ভ্রাতাকে ভজনা করি। এঁরা উভয়েই করুণাময় মূর্তি, এঁরা স্বরূপত অপরিচ্ছিন্ন অথচ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হন, এঁরাই সৎস্বরূপ ঈশ্বর।[৩]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ১
(শ্রীস্বরূপ গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥ ২
কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্॥ ৩
কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ৪
কৃপাসুধাসরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥ ৫
বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ॥ ৬
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥ ৭

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ ৮

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলম্ মূকমাবর্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥ ৯
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥ ১০

শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণপ্রেমেরই বিকৃতি অর্থাৎ বিশিষ্ট প্রকাশ, তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দ-দায়িনী বা হ্লাদিনী শক্তি। তাই তাঁরা একাত্ম হয়েও লীলার জন্যে অনাদি কাল থেকে ভিন্ন দেহ ধারণ করেছিলেন। এখন আবার তাঁরা শ্রীচৈতন্যের মধ্যে একত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি নিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, সেই কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।[১]

আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা করি, যাঁর প্রসাদে বালকেও (অল্পবুদ্ধি জনও) নানা মতবাদরূপ হিংস্রজন্তু-সমূহে পূর্ণ (অর্থাৎ নানা কুতর্কসঙ্কুল) সিদ্ধান্ত-সাগর উত্তীর্ণ হয়।[২]

আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি, কোনোক্রমে যাঁকে স্মরণ করলেই কঠিন কার্যও সহজ হয়ে ওঠে, আবার যাঁকে বিস্মৃত হলে সহজ কার্যও কষ্ট-সাধ্য হয়।[৩]

আমি সেই প্রভু শ্রীচৈতন্যকে ভজনা করি, যাঁর চরণকমলে পুষ্প প্রদান করা মাত্রই কুবুদ্ধি জনও শুদ্ধচিত্ত হয়।[৪]

আমি সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি, যাঁর কৃপারূপ অমৃতের নদী নিখিল বিশ্বকে প্লাবিত করলেও সর্বদা নিম্নগামিনীর ন্যায় প্রতীত হয় অর্থাৎ যারা হীন, পতিত ও অভাজন, তাদের দিকেই প্রবাহিত হয়।[৫]

আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত ও অদ্ভুত এবং যাঁর কৃপায় নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্তক হন।[৬]

আমি সেই করুণাসাগর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, যিনি কলিকালে অতি গূঢ় ভক্তিকে প্রকাশ করেছেন।[৭]

আমি সেই পরম দয়ালু গৌরাঙ্গরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিলাম। তিনি পাপিষ্ঠ জনকেও কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন। এই কৃষ্ণপ্রেম পূর্বে কেউ কাউকে বিতরণ করেন নি। এই স্বপ্রেম-নামামৃত (নিজ প্রেমযুক্ত নামসুধা) ছিল গুপ্তধনের ন্যায় গোপনীয়। সেই সম্পদ তিনি বিতরণ করেছিলেন আপামর সাধারণের ভেতর।[৮]

আমি বন্দনা করি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, যাঁর কৃপা পঙ্গুকেও পর্বত লঙ্ঘন করায়, মূককেও বেদাদি শাস্ত্র আবৃত্তি করায়।[৯]

আমি বন্দনা করি সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামৃত আস্বাদন করেছিলেন, ভক্তদের সে আস্বাদন দান করেছিলেন এবং তাঁদের প্রেমদীক্ষা শিক্ষা দিয়েছিলেন।১০

দীপিকা

সকলেই জানেন, 'ধৃ' ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় যোগ করে 'ধর্ম' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং যা মানুষকে ধারণ করে, তাই ধর্ম,—যা সমাজ বা রাষ্ট্রের স্থিতির মূল, যার দ্বারা লোক-কল্যাণ সাধিত হয়, তাই ধর্ম। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব কর্তৃক রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্ম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণাশ্রম-ধর্মেরও নির্দেশ আছে। আবার ভগবান মনু সর্বকালিক ধর্মের লক্ষণ বলছেন—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্'॥

ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, অস্তেয় (অচৌর্য), দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ।

আবার যুগভেদে মানুষের শক্তির তারতম্য অনুসারেও ধর্মের ভেদ হয়ে থাকে। যুগধর্ম বলতে বোঝায় যুগোপযোগী ধর্ম। নাম-সংকীর্তনই যে কলিযুগের যুগধর্ম এবং এ যুগে যাঁরা সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁর আরাধনা করেন, তাঁরাই যে বুদ্ধিমান, ভক্তিশাস্ত্র-সমূহে সুস্পষ্ট ভাবে পুনঃ পুনঃ সে কথা উক্ত হয়েছে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন, কলিকালে যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তনের জন্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ও হলায়ুধ বলরাম নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন যুগধর্মের প্রবর্তন আর মূল প্রয়োজন নিজ-রসাস্বাদন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বগত উক্তি—

'যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে॥'

আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

'যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥
ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥
আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি ॥
আপনারে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সবভাবে আমি হই তাহাব অধীন ॥'

আমরা যে শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা গ্রন্থ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছি, তা সঙ্কলিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ থেকে। এই বন্দনার প্রথম শ্লোকটি শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর করচা থেকে কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক সঙ্কলিত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের মিলিত-বিগ্রহ, তাই রাধাকৃষ্ণের লীলায় অনুপ্রবিষ্ট হতে চাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিবালীলার স্মরণ-কীর্তনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে স্বরূপ গোস্বামীর রচিত শ্লোকটির তাৎপর্য এই ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হলাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

পদকর্তা গোবিন্দদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জঙ্গম হেমকল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেননা, তিনি স্বয়ং অযাচিত ভাবে আপামর সাধারণ সবাইকে নাম ও প্রেমফল বিতরণ করেছেন। তাই গৌড়ীয় ভক্তগণ বলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের ও গৌরভক্তগণের করুণাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরাও বলি, যে কৃপাসিন্ধুর কৃপাবিন্দু পেয়ে কত পাপী তাপী অভাজন পরিত্রাণ লাভ করেছে তাঁর চরণে যিনি শরণাগত হয়েছেন তিনি মহাভাগ্যবান, ভক্তিশাস্ত্রে যে ভগবৎ-প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়েছে, যে প্রেমের উদয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই প্রেমলাভে তিনি একদিন ধন্য হবেনই, আর সেদিন তাঁরই পদরেণু-স্পর্শে জননী বসুন্ধরা নিজেকে কৃতার্থা মনে করবেন।

গীতায় সমাজ দর্শন ॥ শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে ও আধুনিককালে বহু গীতাভাষ্য ও গীতানিবন্ধ রচিত হয়েছে, বিভিন্ন আচার্য ও মনীষিগণের দৃষ্টিতে গীতা হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শাস্ত্র, কিন্তু গীতার বাণীকে আশ্রয় করে যে আমরা সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারি এবং আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র রচনা করতে পারি, সে সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা ইতঃপূর্বে হয় নি।

বাংলাদেশের সর্বজনমান্য পণ্ডিত এবং সুলেখক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে গীতার নবভাষ্য রচনা করেছেন। লেখকের পাণ্ডিত্য ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গি গ্রন্থখানিকে সর্বজনপাঠ্য করে তুলেছে।

মূল্য : চার টাকা

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ॥ লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ১৪৩২-৩৩ শকে অর্থাৎ ১৫১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সময়ে বিল্বমঙ্গল-লীলাশুক-বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের আবৃত্তি শুনে চমৎকৃত হন এবং গ্রন্থখানির প্রথম অধ্যায়, লহরী, আশ্বাস বা শতকের ১১২ শ্লোক লিখিয়ে পুরীতে আনেন। চৈতন্যদেবের ভক্তবৃন্দ তাঁর আনা পুঁথির নকল করে নেন এবং ১৬ শতাব্দীর উত্তরার্ধে বৃন্দাবনধামে গোপাল ভট্ট, চৈতন্যদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের সুবিস্তৃত টীকা রচনা করেন। ১৭শ শতকে যদুনন্দন দাস গ্রন্থখানির পদ্যানুবাদ করেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় পরম যত্নে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন।

মূল্য : বার টাকা

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ সুধা সেন

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম এখনও বাঙ্গালীর প্রাণধর্মকে প্রবুদ্ধ করছে। শ্রীচৈতন্য চরিত বাঙালীর কাছে 'অমৃত সমান'। শ্রীমতী সুধা সেন আলোচ্য গ্রন্থে তথ্যের জগতে অন্তরের আবেগ সঞ্চারিত করে মহাপ্রভুর জীবনীকে সহজ সুন্দরভাবে পাঠকসমাজে উপস্থিত করেছেন।

মূল্য : আট টাকা

'বাংলার সাহিত্যিক-গোষ্ঠির মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রথম জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সহিত যেরূপ কঠোর সংগ্রাম করিয়া তিনি পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলগুলি হইতে হস্তলিখিত বহু প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে কাহিনী সাহিত্যানুরাগীমাত্রেরই মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করে।। দীনেশচন্দ্র শুধু যে কীটদষ্ট পুঁথির একজন অক্লান্ত সংগ্রাহকই ছিলেন তাহা নয়, তিনি কবিত্ববোধ-শক্তিসম্পন্ন প্রকৃত রসবেত্তাও ছিলেন।'

সাহিত্য সাধক চরিতমালা